Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

রূপায়ণ

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক
সুভো ঠাকুর

লেখক
বুদ্ধদেব বসু
বিনয় ঘোষ
অশোক মিত্র
কমল মজুমদার
আতাউর রহমান
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত
ইন্দ্রানী রহমান
দিনেশ দাস
বিশ্বনাথ চৌধুরী
রঘুনাথ গোস্বামী
আশু চট্টোপাধ্যায়
বিষ্ণু দে
অমল মিত্র
ইত্যাদি

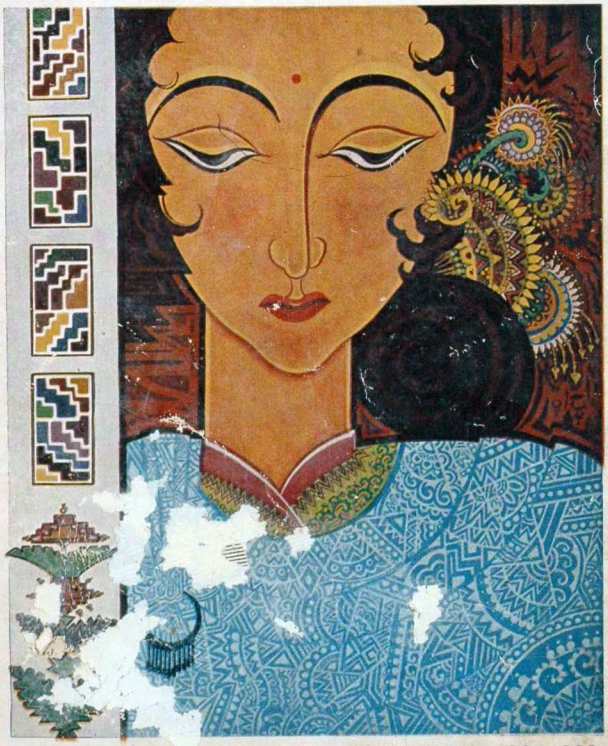

উপরের চিত্রটি—সুভো ঠাকুরের অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

মূল্য—একটাকা

সুন্দরম্

বাংলা ভাষায় ও বাংলা দেশে একমাত্র কলা বিষয়ক মাসিক পত্র

সম্পাদক ঃ সুভো ঠাকুর

প্রথম সংখ্যা — প্রথম বর্ষ

শ্রাবণ। তেরশ' তেষট্টি।

প্রচ্ছদসজ্জা ও লিখন ঃ সত্যজিত রায়

'সুন্দরম্' প্রকাশনীর তরফে চুয়ান্ন নম্বর গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-তের থেকে সুভো ঠাকুর প্রকাশ করেছেন আর চব্বিশ নম্বর রিপন ষ্ট্রিট, আর্টাইন প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ছাপা হয়েছে

সুন্দরম্-এর নিয়মাবলী

সুন্দরম্-এর পরবর্তী সংখ্যাগুলি প্রতি ইংরাজি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বের হবে।

বৎসরে এই পত্রিকার 'শারদীয়া' ও 'খৃস্টমাস' দুইটি যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এর পরের সংখ্যাই "শারদীয়া" সংখ্যারূপে অক্টোবর মাসের প্রথমেই বেরুচ্ছে। পত্রিকার নমুনা বিনামূল্যে পাঠানো হয় না। প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র এক টাকা। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়েবার টাকা। 'শারদিয়া ও খৃস্টমাস' প্রতি সংখ্যাদ্বয়ের মূল্য দু টাকা। অতএব বার্ষিক গ্রাহকরা এই দুটি সংখ্যা—চার সংখ্যা হিসাবে ধরবেন। যাঁরা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হতে চান তাঁরা মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাবেন। প্রতি সাধারণ সংখ্যার জন্য একটাকা চার আনা মনি অর্ডারে পাঠাবেন। 'শারদীয়া' ও 'খৃস্টমাস' সংখ্যার জন্য যথাক্রমে সডাক দু টাকা আট আনা পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম এজেন্ট করা হয় না। অগ্রিমমূল্য না পাঠালে কাগজ পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের প্রতি সংখ্যা পোস্টাল সার্টিফিকেট করে পাঠানো হবে, তাসত্ত্বেও না পেলে, পোস্ট অফিসে খোঁজ করবেন।

সিদ্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্যাধ্যক্ষ 'সুন্দরম্'
৫৪, গনেশচন্দ্র এভিনিউ। কলিকাতা-১৩

Sale Depot I
Santiniketan Road
Bolpur Bazar

Weaving Dept.
Bolpur and Villages of
Birbhum, West Bengal

BOLPUR CO-OPERATIVE
CRAFTS & INDUSTRIES LTD.
HOPE OF UNSKILLED ARTISANS

Sale Depot II
159-A, S. N. Banerjee Rd.
Calcutta—13

Crafts and Furniture Dept.
15-B, Canal Street, Cal.-14
(Phone : 24-3574)

A small List of our Clients :
Rastrapati Bhawan
Calcutta Govt. House
Puri Govt. House
C. P. Govt. House

★

Govt. of West Bengal
Works and Building Dept.
Co-Operative Dept.
Publicity Dept.
Industries Dept.

★

Sri Nanda Lal Bose
(Artist)
Sri Ashit Kumar Haldar
(Artist)
Sri Subho Tagore
(Artist)

★

Rana Subarna Shamsher
Jung Bahadur (Nepal)
Maharani Mayurbhanj
State
Maharani Nandgaon State
Maharani Dumraon State
Maharaja P. M. Tagore

★

Lala Sri Ram (Delhi)
Ambalal Sarabhai
(Ahmedabad)
Lady Ranu Mukherjee
Tata Iron and Steel Co.
Ltd. (Jamshedpore)
Bharat Airways, Calcutta
United Commercial Bank
(Calcutta)

★

Test Board, Calcutta
Universal-International
Films of California
For the film 'River'

★

Specially entrusted for the decorations of Rajbhawan, Calcutta, during the visit of Marshal Bulganin and Nikita Khrushchev.

INVITATION

Dear Sir/Madam,

We are proud to announce that due to your kind help and well wishes we have been able to open our Sales Emporium II, at 139-A, S. N. Banerjee Road, (opposite Regal Cinema) and being subsidised by Govt. We are today permitted to grant a rebate of 9·3/8% on handloom textiles to our patrons.

We feel it is a duty on our part to inform you that this rebate that we give you is being paid by our Govt. for popularising the handloom products and solving the unemployment problem ; mainly this is for putting down the price level and helping the customers.

Our enterprise being a Co-operative one and every individual being a profit sharer, we strongly hope you shall stretch out your generous hand to build our future.

Thanking you,

Yours fathfuly,
S/d. Adrijanath Mukherji
Chairman.

Please reply to Chairman's Office :
"Bholanath Building," 2nd, floor, 167, Old China Bazar Street, Calcutta-1. Phone : 22-5436.

॥ সুভো ঠাকুরের কয়েকটি বই ॥

নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে। (২য় সং)—ছোট গল্প। মূল্য ২॥০

অলাতচক্র—উপন্যাস। মূল্য ৪৲

মায়া মৃগ (সচিত্র)—গীতি কাব্য। মূল্য ৪৲

পট ও ভূমিকা—স্বনামধন্য ব্যক্তিদের কথায় রেখাচিত্র। মূল্য ১৲

৫৪, গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩।

॥ চিত্রবন ॥

আসামের একমাত্র চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বিজ্ঞাপনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম

অফিস :

ম্যানেজারঃ—চিত্রবন, মুনলাইট, জেইল রোড।
গৌহাটি, আসাম।

সুন্দরম্ । প্রথম সংখ্যা । প্রথম বর্ষ । শ্রাবণ । তেরশ' তেষট্টি ।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ১
সুভো ঠাকুর

বাংলার সংস্কৃতির অবস্থা ৫
বুদ্ধদেব বসু

শিল্পী শহর কলকাতা ১৬
বিনয় ঘোষ

পুতুল ও পট ২১
অশোক মিত্র

ঢোক্‌রা কামার ২৯
কমল মজুমদার

পিরামিড রোড ৩৩
আতাউর রহমান

প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য ৪০
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

চীনদেশের নাচ ও নৃত্যনাট্য ৪৭
ইন্দ্রাণী রহমান

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ ৫০
দিনেশ দাস

বাংলার শঙ্খ শিল্প ৫১
বিশ্বনাথ চৌধুরী

প্রচারশিল্পী রনেনআয়ণ দত্ত ৫৫
রঘুনাথ গোস্বামী

ডুভিন ৬৩
আশু চট্টোপাধ্যায়

লোক সঙ্গীত ৬৬
সুর বাহার

আলেখ্য ৭২
বিষ্ণু দে

বাংলা নাট্যশালার দর্শক ৭৩
অমল মিত্র

গ্রন্থ-জগত ৮২
গ্রন্থকীট

নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা সম্মেলন ৮৭
কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়

খবরাখবর ৮৯

বুদ্ধদেব বসু কবি। ঔপন্যাসিক। ছোট গল্প লেখক। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক। প্রবন্ধকার। শিক্ষাবিদ্। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক।

বিনয় ঘোষ 'কলকাতার কালচার', 'কালপেঁচার নক্সা', 'জনসভার সাহিত্য' ইত্যাদির গ্রন্থকার। বাংলার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্য বিষয়ক লেখক হিসাবে সর্বজনবিদিত। অধুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বক্তৃতায় ব্যাপৃত।

অশোক মিত্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য। লোকশিল্প ও কলা সম্বন্ধে সারগর্ভ নানা প্রবন্ধাদির রচয়িতা। বাংলায় চিত্রকলা সম্পর্কে এঁর রচিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য। বাংলার জনসংখ্যার বিবরণীতে (সেন্সাস রিপোর্ট) হস্তশিল্পের এবং তার কারিগরদের সম্পর্কে এঁর লিখিত বিভাগটি একটি বিশেষ অবদান। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত।

কমলমজুমদার লোকশিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। কমিউনিটী প্রজেক্টে লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অধুনা ভারতীয় ললিত-কলা আকাদেমীর অধীনে লোকশিল্পের সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত। সুসাহিত্যিক এবং শিল্পী।

আতাউর রহমান স্বনামধন্য ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুরঙ্গের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব ইয়োরোপ ভ্রমণ সাঙ্গ কোরে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। বর্তমানে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশান্স্-এর অধিকর্তা।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কলকাতার তরুণ বিদগ্ধজনদের অন্যতম। সুলেখক। কলারসিক। অধুনা জে. ওয়াল্টার টম্সন নামক প্রচার প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত।

লেখক পরিচয়

ইন্দ্রাণী রহমান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ভারতীয় নৃত্যশিল্পী। কেন্দ্রীয় সরকারের স্থপতি হবিবুর রহমানের পত্নী। ভারতের 'সৌন্দর্যের রানী' হিসেবে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের উদ্যোগে যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দল চীন পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন, নৃত্যশিল্পী হিসেবে ইনিও ছিলেন তাঁদের সদস্যভুক্ত।

দিনেশ দাস কল্লোলোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ভাব এবং ব্যঞ্জনায় এঁর প্রত্যেকটি কবিতা অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত। আপাততঃ শিক্ষকতার কার্যে ব্যাপৃত।

বিশ্বনাথ চৌধুরী অধুনালুপ্ত 'অগ্রগতি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিছুদিন নিজেও একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদনা করেন। বাংলার লোকশিল্পের পরিসংখ্যান ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য অধিকারের সহিত যুক্ত।

রঘুনাথ গোস্বামী দক্ষ চিত্রশিল্পী হিসেবে অল্প বয়সেই সুনাম অর্জন করেছেন। দিল্লীতে গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ নানা বিভাগে অনেকগুলি পুরস্কার পায়। সুলেখক। বর্তমানে জে ওয়াল্টার টম্সন নামক প্রচার প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রচার শিল্পী হিসেবে যুক্ত। এই সংখ্যা 'সুন্দরম্'-এর সমস্ত রূপসজ্জা এঁরই করা।

আশু চট্টোপাধ্যায় অধুনালুপ্ত 'অগ্রগতি' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। গ্রন্থকার। বহু উপন্যাস গল্প ইত্যাদির লেখক। 'আনন্দবাজার' 'দেশ' 'মাসিক বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখেন।

বিষ্ণু দে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। সমালোচক। প্রবন্ধকার। শিক্ষাবিদ্। ভারতীয় ললিতকলা আকাদেমীর সদস্য। সরকারী সেণ্ট্রাল কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক।

অমল মিত্র সুলেখক। কলকাতার পুরাকালীন নাট্যশালা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ইত্যাদি পত্রিকায় সচরাচর এঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

সুন্দরম্। প্রথম সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। স্বাধীনতা দিবস। তিরিশে শ্রাবণ। তেরশ' তেষট্টি।

সম্পাদকীয়

সুভো ঠাকুর গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত দিল্লী-বোম্বাই করার দরুণ—রাজধানী দিল্লীর এবং উপরাজধানী বোম্বাই শহরের বহু শিল্পীগোষ্ঠীর এবং নানাস্তরের আধুনিক শিল্পীদের সরাসরি সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

আদতে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় চিত্র, শিল্পকলা ও কারুকলার একটি প্রদর্শনী বাইরে, অর্থাৎ ভারতের বাইরে প্রায় দশ-বারোটি দেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাপনায় ও প্রস্তুতিতেই বারম্বার ঐসব রাজধানী এবং উপরাজধানীতে গতায়াতের কারণ ঘটে। গণ্ডগ্রাম নিবাসী তথা কলকাতার বনেদী বাসিন্দে সুভো ঠাকুর স্বাধীন ভারতের ঐসব সুমহান শহরে পদার্পণ করার সুযোগ পেয়ে অনেক কিছু ভাববার, দেখবার ও করবার প্রেরণা লাভ করে। ঐ সকল মহানগরীর আধুনিক মহা-মহা শিল্পী মহারথীদের সঙ্গে এই নৈকট্যলাভের আরো একটি বিশেষ আবশ্যকও ছিল। অর্থাৎ, উপরোক্ত প্রদর্শনীর সর্বভারতীয় পুরাকালীন শিল্প ও কারুকলার নানা বিভাগের জিনিসপত্র পূর্ব হোতেই সুভো ঠাকুরের সংগ্রহে ছিল—ছিলনা কেবল দিল্লী-বোম্বাই-এর শিল্পীদের চিত্র। তাই রাজধানী দিল্লীর এবং উপরাজধানী বোম্বাই শহরের আধুনিক শিল্পীদের চিত্রকলা সংগ্রহ করার তাগিদই—ঐসব শিল্পীদের সান্নিধ্য লাভের আর একটি কারণ।

ঐসব শহরের অধিবাসী প্রায়শঃ প্রতিটি স্বনামধন্য শিল্পীর সঙ্গে ঐরূপ সাক্ষাৎকার এবং তাঁদের সহানুভূতিলাভে ধন্য হওয়া—একটি বড় কম ভাগ্যের কথা নয়! নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা! দিল্লী দরবারের দরবারী শিল্পীদের প্ল্যাকার্ড অথবা প্রচার-পত্র যে আন্তর্জাতিক প্রাকারে সাঁটানো হয়ে থাকে অহরহ! খ্যাতি তাঁদের গোলোকময়—গোলপার্কের গোলক ধাঁধায় মর্তের অধিবাসীবৃন্দের কাছে দিল্লী গোলোক ছাড়া আর কি? এর উপর, কোথায় আমেরিকা! কোথায় রাশিয়া! ঐসব দূতাবাসের আমন্ত্রণে কথায় কথায় 'ভোদ্‌কা' 'মার্টিনি' 'হুইস্কি'র ছড়াছড়ি। যে সব শব্দের উপযুক্ত উচ্চারনের প্রচেষ্টায় এখানকার শিল্পীর অপঘাতের আশু সম্ভাবনা! তার উপর উপরি হিসেবে 'ককটেলে'র কাতুকুতু তো আছেই। কলকাতার মত মর্তের অধিবাসীদের কাছে এইসব হকচকানি ব্যাপারে হাঁ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি! তাঁদের অর্থাৎ সেই সব রাজধানীর ও উপরাজধানীর শিল্পীদের প্রচারে ক্ষণে ক্ষণে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির নোলক নড়ে, টনক নড়ে সর্বভারতীয় পত্রিকার আর্ট ক্রিটিকদের। সুরু হয় কত না কিচির মিচির। দেশ-বিদেশের পত্রিকার পাতায় পাতায় তাঁদের পাতা পড়ে। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে আসর তাঁদের জমজমাট!

এছাড়া দিল্লীর স্টেটস্‌ম্যানে, দরবারীদের দর বাড়িয়ে ভারতীয় আর্টের কর্ণধরে কর্ণধার—দিশী আর্টের বিদেশী সমালোচকটি তো আছেনই! উপরন্তু আছে দিল্লী আর্ট সোসাইটির উকিল-ভ্রাতা প্রতিষ্ঠিত কলা-পত্রিকা 'রূপলেখার' ওকালতি—সেটাও বড় কম নয়!

তবে উপরাজধানী বোম্বাই শহর 'উপ' কিনা তাই রাজধানীর তুলনায় কিঞ্চিত মাত্রায় অন্য স্তরের হলেও সে-উপকথার উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয়, যে সেখানেও আছে—'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার' প্রাতঃকালীন এবং সন্ধ্যা-কালীন সংস্করণে আধুনিক বোম্বাই-শিল্পীদের নিয়ে কত না মারপ্যাচ্। তাঁদের সচিত্র নানা বিবরণী নানা ভাবে প্রায়শই উচ্চৈস্বরে এবং সগৌরবে ঘোষিত।

এছাড়া আরও আছে—'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি'। যার 'কালার স্প্রেড্' বা রঙিন পক্ষ বিস্তারের তলায় এমন কি দিল্লীর দরবারী শিল্পীদের দাম্ভিকতাও দমে থাকতে বাধ্য।

সুভো ঠাকুরের এই অবতরণিকার অবশ্যই একটা আবশ্যক ছিল। কারণ, সেই তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি আর্ট জার্নাল কিনা কলা বিষয়ক পত্রিকার একান্ত অভাব আন্তরিকভাবে অনুভব করতে সুরু করে ও'। একপক্ষে এটা জাতীয় অভাবেরই অন্যতম হিসেবে ও'র অন্তরকে নাড়া দেয়।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক সাহিত্যের মতই ভারতবর্ষে অবনীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক শিল্পকলার সর্বপ্রথম সূত্রপাত এই গণ্ডগ্রাম সুতানটী-গোবিন্দপুর থেকেই কিনা।

সুভো ঠাকুর বোলতে কুণ্ঠা বোধ করেনা যে কল্লোল গ্রুপ অথবা গোষ্ঠীর ন্যায় ক্যালকাটা গ্রুপ অথবা গোষ্ঠীই অবনীন্দ্র-পরবর্তী যুগের ভারতের আধুনিক শিল্পকলা বোলতে গেলে যা বোঝায়—তার একরকম জন্মদাতা। কিন্তু ভাগ্যের লিখনে বাংলাদেশ বাঁটোয়ারার পর বাম হস্তের অবহেলিত বিতাড়ন ব্যতীত, উত্তরে দিল্লীর দরবার এবং পশ্চিমের উপরাজধানী বোম্বাই শহর—কেহই বড় একটা বাংলার আধুনিক শিল্পীদের প্রতি সবিশেষ স্বীকৃতিসহ উপুড় হস্ত করতে ইচ্ছুক বলে ধারণা হয় না। খুবই স্বাভাবিক। ঋণ স্বীকার অতীত অথবা আদিম যুগের প্রথা। ঋণকে অস্বীকার করাই এ যুগের মহৎ বাণী!

যাই হোক, বাঙালী তথাকথিত 'অপদার্থ জমিদার-কুল' যাঁদের মাত্র দোষাবলীই সচরাচর বৃহৎ করণ করা হয়ে থাকে—তাঁদেরই বাংলার শিক্ষা ও কলাকৃষ্টির উন্নয়নের ব্যাপারে উদার পৃষ্ঠপোষকতা এবং অর্থানুকূল্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হলেও, অধুনা সেই সব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় বর্ধিত জমিদারবৃন্দ মহাপ্রস্থানের পথে। ভগবানের নামোচ্চারণের সঙ্গে কালের কবলে যে সব কিছুই অ-চিরস্থায়ী, এই মহৎবাক্য মনন কোরে মৃত্যু-মুহূর্তের অপেক্ষায়। এমতোবস্থায় দেবী লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র চঞ্চলা পেচকটি যে শ্রেণীর হাতে এসে আপাততঃ ভর করেছেন তাঁদের অধিকাংশই এ প্রদেশের নন, এমন কি এ ভাষাভাষীও নন অর্থাৎ এখানকার সব কিছুর সঙ্গে মাটির টান অথবা নাড়ীর টান কোন কিছুই তাঁদের নেই। তাই সাহিত্য কলা-কৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাপারে সমঝদারি অথবা জ্ঞান না থাকলেও অন্ততঃপক্ষে

দেশজ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হোয়েও যে এই সব সৎকার্যে এবং প্রচেষ্টাতে কদাপি পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট করবেন এমত ভরসাও তাঁদের প্রতি করা অন্যায় হবে না কি?

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ব্যাপারে যে পরিবারের নাম আজিও চিরস্মরণীয়, সেই পরিবারের আজ ঘরের খাবারে একান্ত অনাটন ঘটলেও সুভো ঠাকুর সেই পরিবারেরই একটি অধস্তন বংশধর। অতএব লাভ হোক, লোকসান হোক অর্থের স্বচ্ছলতা থাকুক আর নাই থাকুক—আর্ট জার্নাল অর্থাৎ কলা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা তার একটি বের কোরতেই হবে।

ইতিমধ্যে ভ্রাম্যমান কলাপ্রদর্শনীসহ ইজিপ্ট, ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, তুর্কী, বোগদাদ, বসরা কত দেশই না ঘুরল ও'—মনের মধ্যে ক্রমাগত মন্থিত হোয়েছে সেই এক কথা—কি কোরে বাংলা দেশে একটা আর্ট জার্নাল বের করা যায়।

তারপর গত বছর দেশে ফিরে এসে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ সুরু হোল। ততক্ষণে সুভো ঠাকুর কিন্তু স্থির কোরে ফেলেছে যে মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলাভাষায় একটি আর্ট জার্নাল ও বের কোরবেই। অবিশ্যি বন্ধুবান্ধবরা সবাই ওকে নিরুৎসাহ কোরেছে, বোললে, একে আর্ট জার্নাল তাতে বাংলাভাষায়! ইংরাজীতে কোরলে না হয় কথা ছিল বিলিতি কোম্পানীর বিজ্ঞাপন পাওয়ার সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক প্রচারেরও একটা আশা থাকে। কিন্তু সুভো ঠাকুর ভাবে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি মাতৃভাষাতেই লিখেছিলেন। অনুবাদ করেছিলেন ইংরাজিতে। এব্যাপারে দিল্লী বোম্বাই-এর কথা কিন্তু নেহাৎ-ই আলাদা। কারণ সেখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়—মাতার কোলে জন্মলাভের পরক্ষণেই হয়তো তাঁর শারীরিক কোন দুর্বলতা হেতু ইংরাজি ভাষার 'ওয়েট নার্শ' অথবা ধাই-এর স্তন্য পান করেই সচরাচর বর্ধিত হতে বাধ্য হন। তাই তাঁদের পক্ষেই পরগাছি ভাষার আগডালে বসে ময়ূর পুচ্ছ শোভিত কাকের ন্যায় পুচ্ছ নাচন সম্ভব। কিন্তু সুভো ঠাকুরের সুনিশ্চিত ধারণা এই যে বাংলার মাটির উপযুক্ত যে ফুলগাছ, তাকে আগে নিজের বাংলার মাটিতেই রোপন কোরতে হবে। বর্ধিত করতে হবে। দেশের সাধারণ লোককে কলা বিষয়ে আগ্রহশীল করে তুলতে হবে। তারপর সেই ফুলগাছে যেদিন ফুল ফুটবে—সেই ফুলকে তোড়া বানিয়ে উপযুক্ত হোলে উপহার পাঠাতে হবে দেশ দেশান্তরের ফুলদানিতে। সাজাবার জন্যে। অর্থাৎ দরকার হোলে তখনই কেবল এই বাংলা আর্ট জার্নালের একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা পরের কথা।

এরপর আপত্তি এলো অতিশয় কড়া যুক্তি সহ—এই, যে ঘন ঘন আণবিক এবং উদ্‌যান বোমার বিস্ফোরণের উদ্‌গারিত বিষবাষ্পে যখন সমগ্র পৃথিবীর মুখমণ্ডল বিদারিত বিস্ফোটকের আকার ধারন করতে বসেছে, যখন সমাজ সংসার ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডের দাঁড়িপাল্লার দড়ি প্রায় ছিন্নমূল, যখন এই বিভক্ত প্রদেশে অগনিত উদ্বাস্তুর হাহাকার—রাজনৈতিক ভাবী অস্পষ্টতার সম্ভাবনা যখন প্রচুর, তখন এই আর্ট জার্নালের স্থান কোথায়?

এর উত্তরে সুভো ঠাকুর বলে মানুষের ইতিহাসে দেখা গেছে আদর্শের জন্য ফাঁসিকাঠের দড়িতে ঝুলতে গিয়ে মানুষ গান গাইতে গাইতে মরেছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহু বিদেশী সৈনিককে দেখা গেছে—যামিনী রায়ের একখানি ছবি কিনে কাঁধে বেঁধে চলেছে লড়াই করতে। আলোড়ন, পরিবর্তন এবং সর্বাপেক্ষা দুঃসময়ের মধ্যে দেখা গিয়েছে মহৎ শিল্পের আবির্ভাব, তাই 'সুন্দরম্' এই মহা দুঃসময়ে সেই মহতি সৌন্দর্যের আশার বাণীই বহন কোরে আনবে। আর ঠিক এই কারণেই আজ তার আত্মপ্রকাশ। তবে 'সুন্দরম্' এ-বিষয়ে সচেতন যে সমাজ সংসার, ন্যায় অন্যায় যে সমস্তার সম্মুখীন হতে চলেছে আজ, সেখানে শিল্পের সাহিত্যের সংস্কৃতির পারম্পর্যের আমূল পরিবর্তন হোতে বাধ্য। নতুন আঙ্গিকে যে নতুন সৌন্দর্য বিকশিত হবে তাকেই তো স্বীকার করে স্বাগতম জানাতে চলেছে 'সুন্দরম্'। কালের হাওয়াকে যে অস্বীকার কোরবে সে মহাকালকেই অস্বীকার কোরতে চায়। 'সুন্দরম্' অতীতকে সদাই স্মরণ রেখে সম্মুখে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী।

ঐ রঙিন 'জুম্বুল্' ফুলের
পাপ্‌ড়িগুলো
মৃত প্রজাপতির ডানার মত
মাটিতে লুটিয়ে !

অন্ধকার আকাশের তারাগুলো
চোখের জলের মত
ঝিক্‌মিক্ করে।

—সত্যি কি ?

কত মিথ্যার জালই না বুনতে হয়
একটি সুন্দরের সৃষ্টিতে !

পাপ্‌ড়ি তো আর সত্যিকারের
প্রজাপতির ডানা নয়,
আর সত্যিকারের চোখের জলও নয়
ঐ আকাশের তারারা ···

একটি যুগোশ্লাভীয় কবিতার অনুসরণে

বাংলা সংস্কৃতির অবস্থা

বুদ্ধদেব বসু

এ-বছর প্রজাতন্ত্র-দিবস উপলক্ষ্যে নয়া দিল্লির বেতারকেন্দ্র একটি কবিসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন; হিন্দি ভাষার চারজন এবং অন্য প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার একজন ক'রে কবি সেখানে ছন্দোবদ্ধ রচনা পাঠ বা গান করলেন ; সে-সব রচনার আদর্শ মহৎ, ভাব অতি উচ্চ ; ভারতের সংহতি, জাতীয়তাবোধ, পঞ্চশীল, পঞ্চবার্ষিকী সংকল্প, বিন্ধ্য হিমাচল গঙ্গা যমুনা গোদাবরী, মৈত্রী ও অহিংসা—যা-কিছু দেশনায়কের বাগ্মিতার অঙ্গ, সংবাদপত্রের আলোচ্য ও জনগণের শিক্ষণীয় সবই ছন্দে সুরে পুনরাবৃত্তিতে নির্দিষ্ট তিন মিনিটের সীমানা পেরিয়ে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো ; রাম বুদ্ধ, গান্ধী এবং বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের স্তোত্রপাঠ শুনে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন ; এবং যানবিরল রাজধানীর কনকনে ঠাণ্ডাতেও রাত বারোটার আগে সভা ভাঙলো না।

এই অতিশয় উৎসাহজনক অনুষ্ঠানের মধ্যে অতিশয় খাপছাড়া ছিলেন বাঙালি কবি ; একমাত্র তিনি একটি 'নেহাৎ কবিতা' পড়লেন, তাতে ছাব্বিশে জানুয়ারি বা ভারত-প্রসঙ্গের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিলো না ; সুর ক'রে পড়লেন না (বাংলাদেশে তা অচিন্তনীয়), কোনো-একটি পংক্তিরও পুনরুক্তি করলেন না ; আর তাই নির্দিষ্ট তিন মিনিটের মধ্যেই পড়া শেষ হ'লো তাঁরই একমাত্র। কিন্তু সেই বাংলা কবিতা, সখেদে বলতেই হয়, বড়ো ক্ষীণ শোনালো সেখানে, দেশপ্রেম ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসের মধ্যে একেবারেই অর্থহীন ; ও-রকম একটা প্রেমঘটিত রচনা (রাধাকৃষ্ণের প্রেম পর্যন্ত নয় !) রাজসভায় পাঠ করাটা যে কত বড়ো ঔদ্ধত্য তা শ্রোতৃবর্গের নিঃসাড় মুখমণ্ডলে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হ'লো। এক কথায়, নিখিল-ভারত-কবিসম্মেলনে বাঙালি কবি রীতিমতো লজ্জা পেলেন।

অবশ্য ঐ কবি তাঁর স্বদেশেও ব্যক্তিবাদী ব'লে কুখ্যাত, কিন্তু তাঁর বদলে অন্য কোনো বাঙালি কবির কথা কি আমরা ভাবতে পারি, যাঁর দ্বারা আলোচ্য অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুখরক্ষা সম্ভব হ'তো ? না, পারি না ; কতিপয় স্কুলপাঠ্য-পদ্যলেখক বাদ দিয়ে তেমন একজনের কথাও ভাবতে পারি না আমরা।

'ছাব্বিশে জানুয়ারি' নাম দিয়ে কবিতা লিখতে পারতেন শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, কিন্তু উক্ত তারিখের সঙ্গে কবিতাটির সম্বন্ধ কী তা ও-রকম আসরে কিছুতেই প্রতীয়মান হ'তো না ; শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় দেশ-বিদেশের বহু রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ থাকতে

পারতো, কিন্তু তাঁর চিত্রকল্পবহুল নিবিড় বাক্যবন্ধ থেকে অভিপ্রায়টাকে শোনামাত্র উদ্ধার করা অসম্ভব হ'তো ; এবং এ-কথাও ধারণার অতীত হ'য়ে থাকতো যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর 'হায়রে, এও তো ফেরা ট্রেনের কথা'-র মতো পংক্তি দেশপ্রেমেরই একটা প্রকরণ। বাংলাদেশে আরো অনেক কবি আছেন যাঁরা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বিষয়ে লিখে থাকেন, কিন্তু গণসাহিত্যের উৎসাহীতম প্রবক্তারাও কাজের বেলায় মুশায়েরার উপযোগী সারল্য দেখাতে পারেন না ; তা সম্ভব ছিলো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আর তাঁর পরে নজরুল ইসলামের পক্ষে ; কিন্তু, হায়, সত্যেন্দ্র-নজরুলের দিন আর নেই, ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে, মাত্র তিন দশকের মধ্যে বাংলা কবিতা চাপা, জটিল এবং সাংকেতিক হ'য়ে উঠলো —শোনবার নয়, পড়বার জিনিশ, গোষ্ঠীর নয়, ব্যক্তির ব্যবহার্য, শুধু পড়বারও নয়, চিন্তা করার, চর্চা করার, বিশ্লেষণ করার উপযোগী ও মুখাপেক্ষী।

অবশ্য এও সম্ভব যে ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও তরুণ কবিরা পরিবর্তনের প্রয়াসী, কিন্তু তাঁরা এখনো যথোচিতভাবে খ্যাতিলাভ করেননি। কিংবা, উপস্থিত কবিগণের মধ্যে হয়তো কেউ-কেউ সত্যিকার রসজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু দিল্লিতে এসে তাঁরা কবিত্বের পরিচয় দিতে চাননি, দেশপ্রেম বা রাজভক্তির নিদর্শন দিতেই উৎসুক ছিলেন। কিংবা আরো একটা সম্ভাবনা মনে হচ্ছে আমার—তাঁদের রচনা স্বভাবতই মধ্যযুগের আদর্শ মেনে চলে, সর্বজনবোধ্য সরল বিষয়ের তরলতম ব্যাখ্যাতেই তাঁদের মন ও ছন্দো-বিন্যাস অভ্যস্ত। এই সম্ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁদের পাঠের প্রকরণে ; সুর ক'রে পড়া, এবং শ্রোতৃবৃন্দের বিভিন্ন অংশকে লক্ষ্য ক'রে একই পংক্তির বহুবার পুনরাবৃত্তি, এ-সবই মধ্যযুগের চরিত্রলক্ষণ, সেই লোকসাহিত্য-নির্ভর মধ্যযুগ, বাংলাদেশে যা মুমূর্ষু ব'লেই বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন তাকে লোকসমক্ষে উপস্থিত করতে সচেষ্ট। মোটের উপর, দিল্লির সভা থেকে এই শিক্ষা নিলে ভুল হয় না যে নিখিল-ভারতের মনোলোক এখনো মধ্যযুগের কৃষিপ্রধান ও অবসরময় ঐতিহ্যের মধ্যে আশ্রিত হ'য়ে আছে ; কিন্তু বাংলা প্রবেশ করেছে উনিশ শতকের যন্ত্রযুগে, অংশত বিশ শতকে। আজকে যাঁরা নিখিলভারতের পরিকল্পনা করছেন তাঁরা এই কথাটি ভুলে থাকলে নিদারুণ ভুল করবেন ; মনে রাখতে হবে আধুনিক ভারতের সব অংশ সমানভাবে পরিণত হয়নি, এবং যে-কোনো স্থলে কল-কারখানা রাতা-রাতি গজিয়ে তোলা সম্ভব হ'লেও মনের বদল সময়সাপেক্ষ। উদাহরণত, উত্তরপ্রদেশে নগর, বিশ্ববিদ্যালয়, সম্ভবত কারখানার সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি, কিন্তু সেই প্রদেশের বর্তমান সাহিত্য বিশ শতকের সুদূরবর্তী।

অনেকে ব'লে থাকেন, ইংরেজ প্রথম বাংলাদেশেই এসেছিলো, তাই বাঙালিরা 'সুবিধে পেয়ে এগিয়ে গেছে।' কিন্তু তারও আগে পর্তুগীজ এসেছিলো দাক্ষিণাত্যে, বম্বাই দ্বীপেও পশ্চিমী সংস্রব পুরোনো কথা। আজ থেকে তিন বা চার শতক আগে, ভারত-উপকূলের সবগুলি জন-পদেই য়োরোপের দূত এসে পৌঁছেছিলো—প্রায় একই সময়ে। এর মধ্যে বাঙালির চিত্ত এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠলো কেন ? তার কারণ, বাঙালির ছিলো সেই আগ্রহ, সংবেদনশীলতা, শোষণশক্তি, যার বলে য়োরোপীয় সংস্পর্শকে সে মনের সম্পদে পরিণত করতে পারলে। এ-কথাটি রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয়ভাবে বলেছিলেন : 'এটা ইংরেজের জন্য হ'তে পারে, কিন্তু ইংরেজের জন্যই হয়নি ; ইংরেজের বদলে ফরাশি হ'লে আমরা সবাই মোপাসাঁ হ'য়ে উঠতুম।' য়োরোপীয়রা আমাদের সাহিত্য পড়াতে আসেনি, এসেছিলো বাণিজ্য করতে, রাজত্ব করতে ; কিন্তু, সেই অভিশাপ থেকেই আশীর্বাদ নিষ্কাশন ক'রে নিয়েছিলো বাঙালি, তারপর যথাসময়ে অভিশাপের অপসারণেও অগ্রণী হয়েছিলো। বাংলার স্বদেশী যুগ, এবং সেই যুগের অন্তরাগ, তার সাহিত্যে কী-রকম ভাবে সফল হয়েছিলো সে-কথা কাউকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। অসহযোগ এবং তার পরবর্তী সব আন্দোলনে কাজ অনেক বেশি হ'লো, কিন্তু গান আর হ'লো না ; তখনো, যে-কোনো সংকটের সময়, সারা দেশের প্রতিবাদ ও প্রতিজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্য দিয়ে মুখর হ'য়ে উঠলো। বাঙালির সহজাত সাহিত্যিক মনের এখানেও পরিচয়।

এখন কথা হচ্ছে, বাংলার সঙ্গে ভারতের এই ব্যবধানে ভারতের কোনো অসুবিধে নেই, বাঙালি লেখকই বাধাগ্রস্ত। ভাষাবহুল ভারতীয় ভূখণ্ডকে য়োরোপের সঙ্গে

তুলনা করা যেতে পারে ; যেমন য়োরোপীয়, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি নামক একটি সমগ্রকে অনুভব করা যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা ও জীবনধারার বৈচিত্র্যের মধ্যেই তার সংহত ও সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে। একই য়োরোপের মধ্যে যেমন ফরাশি, জর্মন, ইংরেজ, ইতালিয়ান, তারা আত্মীয় হ'য়েও ভাষায়, অভ্যাসে, মানসতায় স্বতন্ত্র, তেমনি ভারতে মরাঠি, তামিল, পঞ্জাবি, বাঙালি। এই বৈচিত্র্য-বিন্যাসেই য়োরোপের মহত্ত্ব, এবং ভারতের কোনো গৌরবের যুগ আবার যদি কখনো দেখা দেয়, তাও সম্ভব হবে—স্বাতন্ত্র্যবিলোপে নয়, স্বতন্ত্র সূত্রগুলির বয়নশিল্পের দক্ষতায়। কিন্তু য়োরোপের সঙ্গে ভারতের একটি প্রভেদ, এবং ভাগ্যহীন প্রভেদ এই যে, য়োরোপের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে (এবং বর্তমানে য়োরোপ ও আমেরিকার মধ্যে) যে-মানসবাণিজ্য অনবরত প্রবহমান, ভারতে তার আভাসমাত্র নেই। নেই, তার কারণ কোনো পক্ষের প্রাদেশিকতা বা মনো-বিকার নয় ; তারও কারণ সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারতের অসমান পরিণতিলাভ। রেনেসাঁস থেকে যন্ত্র-বিপ্লবের সময় পর্যন্ত, য়োরোপের দেশগুলিতে সর্বাঙ্গীণ সাধনার ধারা দেখা যায় : যুদ্ধ, বাণিজ্য, নৌবিদ্যা, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, জনকল্যাণ, কিছুই বাদ পড়েনি, বিভিন্ন কর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে দেশের ধন ও মন যুগপৎ পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দেখতে পাই, বিভিন্ন কর্মের মধ্যে এই সমৃদ্ধক্ষমতা প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ যুগের পরেই নষ্ট হ'য়ে গেলো ; মধ্যযুগে উত্তরভারতে ধর্মসাধনার ব্যাপকতা, যার জন্য আজও আমাদের 'আধ্যাত্মিক' জাতি ব'লে খ্যাতি ও কুখ্যাতি, তার আসল কারণ হ'লো তৎকালীন রাষ্ট্রিক অস্থিরতা, আর সৈনিক বা রাজনৈতিক ব্যতীত অন্য মানুষের মর্যাদাহ্রাস। এবং পাশ্চাত্য সংঘাতের পর, ভারতের উদ্যম যেন ভিন্ন-ভিন্ন একক ধারায় বিভক্ত হ'য়ে পড়লো ; ইংরেজ-বর্ণিত যোদ্ধ-জাতিরা শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধের অভাবে ক্রীড়া নিয়েই ব্যাপৃত হলেন ; যাঁরা বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করলেন তাঁরা বংশপরম্পরায় অন্য কিছু ভাবলেন না ; এবং যাঁরা মনের দিক থেকে জেগে উঠলেন তাঁদের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত ভাবলোকেই আবদ্ধ থাকলো। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সবচেয়ে উল্লেখ্য উদাহরণ বাঙালি। বাঙালির অন্য যে-দোষই থাক, তার চিত্তের উৎসুকতাকে অস্বীকার করা যায় না ; নতুন চিন্তায়, নতুন পরীক্ষায়, কোনো ভাবনার মায়ামৃগ অথবা বন্যহংসের পশ্চাদ্ধাবনে তার উৎসাহ তাকে ভারতের চোখে কখনো হাস্যকর ক'রে তুলেছে, কখনো বা অনুকরণীয়।

একবার ট্রেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন কতিপয় মাড়বারবাসী বণিক। তাঁদের একজন আমাকে জিগেস করলেন, আমি কী কর্ম করি। আমি পুস্তকাদি লিখে থাকি শুনে বললেন, 'লেখো ? কী লেখো বাবু ? স্কুলের বই ?' আমাকে বলতে হ'লো যে আমি স্কুলের বই লিখি না, গল্পের বই লিখি। 'গল্পের বই লেখো কেন, বাবু ? ও দিয়ে কী হবে ? ধর্মের কথা লেখো, ভগবানের কথা লেখো।' এই উপদেশ শ্রদ্ধেয় নয় তা আমি বলি না, কিন্তু আমাদের মতে সার্থক সাহিত্যমাত্রই ধর্মের কথা, ভগবানের বিজ্ঞাপন।

উক্ত বণিকের কাছে 'ধর্ম' আর 'গল্প' ছুটো আলাদা জাতের এবং পরস্পর-বিরোধী জিনিশ, রামায়ণকে তিনি গল্প ব'লে ভাবতে পারেন না, এই কথাটাই এখানে উল্লেখ্য। তাঁর জগতে কাব্যের অস্তিত্ব নেই।

আর একবার মার্কিনদেশে এক দক্ষিণদেশীয় অধ্যাপকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। আমি তাঁকে তাঁর ভাষার বিষয়ে জিগেস করলাম। তিনি বললেন, 'আমরা তামিল, কিন্তু তামিল ভাষাকে আমি ঘৃণা করি। আমার কাছে ওটা মর্কট-নিনাদ ছাড়া কিছু না।'

এই ক্ষুদ্র ঘটনা ছুটো থেকে কোনো সাধারণ সত্য আমি নিষ্কাশন করতে চাচ্ছি না ; আমি জানি, ভারতে সর্বত্রই রসজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, এবং দক্ষিণবাসীরা মাতৃভাষা-চেতন। কিন্তু ঐ দক্ষিণেই—এবং কিছুটা পাঞ্জাবে—ইংরেজি ভাষা কিছু অদ্ভুতভাবে আসন বিস্তার করেছে ; সেখানে মনীষীরা ইংরেজি ভাষায় কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য রচনা ক'রে থাকেন, এবং শিক্ষিত সমাজে পারিবারিক মহলেও ইংরেজির ব্যবহার অচলিত নয়। দেশের উচ্চতর শ্রেণীর সঙ্গে মাতৃভাষার বিচ্ছেদ সেখানে এখনো দূর হ'লো না, এদিকে বাংলায় রামমোহনের সময় থেকেই বাংলা ভাষা সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলত, পদ্মার দুই তীরের

বাঙালি যখন বাংলা ভাষা নিয়ে হুলস্থুল করে, তখন—ব্যবসা নয়, চাকরি নয়, খনি অথবা কারখানা নয়, শুধুমাত্র ভাষা নিয়ে এই আন্দোলনের তাৎপর্য নিখিলভারত ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। বাঙালির যা প্রাণের সম্পদ, ধমনীর ছন্দ, যেখানে সে সমগ্রভাবে সর্বজনীন প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করেছে, তার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ অন্যদের কাছে আতিশয্য বা প্রাদেশিকতা ব'লে বোধ হয়। এবং সাহিত্য বা শিল্পকলাকে বাঙালি যে-পরম মূল্য দিয়ে থাকে সেটাও সব সময় অন্যত্র স্বীকৃত হয় না; পুর্বোক্ত বেতার-অনুষ্ঠান থেকে ধারণা হয় অন্য দেশের কবিরা কাব্যকে ভারত-উন্নয়নেরই একটি উপায়মাত্র ব'লে ধারণা করেন। এই রকম অবস্থায় সর্বভারতীয় পটভূমিতে বাঙালি লেখকের সত্যিকার কোনো স্থান হ'তে পারে কিনা, এবং য়োরোপের মতো ভারতে একটি নিত্যসচল বিনিময়বহুল সাহিত্যসমাজ গ'ড়ে উঠার সম্ভাবনা কতটুকু, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

কেউ-কেউ ব'লে থাকেন এই অবস্থা সংশোধনের একটি উপায় রাষ্ট্রভাষার প্রচার। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সে শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই, সাহিত্যিক কারণে তার কোনো ব্যবহার হ'তেই পারে না। য়োরোপে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা আছে ব'লে সেখানে একটি ক্রিয়াশীল সাহিত্যসমাজ গ'ড়ে ওঠার বাধা হয়নি, কিংবা—লাতিন-শাসিত হোলি রোমান এম্পায়ারের ধ্বংসের পর—এমন প্রস্তাবও কখনো শোনা যায়নি যে সারা য়োরোপ এক ভাষা গ্রহণ করুক। য়োরোপের সঙ্গে ভারতের অন্য একটি প্রভেদ আমি ভুলে যাচ্ছি না; য়োরোপ ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, আর ভারত একরাষ্ট্রে বিন্যস্ত। কিন্তু রাষ্ট্র একটি যন্ত্র মাত্র, আর সম্প্রতি—বিশেষত হিটলার-স্টালিনের মতো একনায়কের উদাহরণে—সে-যন্ত্র অত্যন্ত বেশি যান্ত্রিক হ'য়ে উঠেছে, অত্যন্ত বেশি শক্তিশালী, এবং হৃদয়হীন। আজকের দিনে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা যে মানুষের সহজবুদ্ধি ও স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে কতদূর লঙ্ঘন করতে পারে, তা যে বহুদূরবর্তী এবং বহুলভাবে অনাত্মীয় দুই দেশকেও এক রাষ্ট্রের মধ্যে গ্রথিত করার শক্তি রাখে, তার অন্যতম প্রমাণ পাকিস্তান। অবশ্য ভারতে, য়োরোপের মতোই, ভৌগোলিক সংযোগ আর সুদীর্ঘ সামান্য ইতিহাসের সম্বন্ধ রয়েছে; কিন্তু কোনো একটি ক্ষুদ্রায়তন, একভাষী য়োরোপীয় দেশের মতো সে নিবিড়ভাবে একরাষ্ট্রে সংবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না; তার ভিন্ন-ভিন্ন অংশগুলি, এক ভারতীয় রাষ্ট্রিক পটভূমিকার অন্তর্গত থেকেও, ব্যবহারে, মানসতায়, সমাজব্যবস্থায় ও সর্বোপরি ভাষায় স্বতন্ত্র ব'লে তারা প্রত্যেকেই এক-একটি 'দেশ' ব'লে গণ্য হ'তে পারে, এবং কার্যত হ'য়ে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যজনিত বৈচিত্র্যেই ভারতীয় সভ্যতার আবহমান সমৃদ্ধি। আজকের দিনে তা বর্জন করার কোনো কথাই ওঠে না; বরং এখনই সেই সময়, যখন প্রত্যেক প্রদেশ আপন-আপন চরিত্র অনুযায়ী সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে চায়। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করা যেতে পারে; সেই বিশাল দেশ এক ভাষা বলে, প্রজাগণ অত্যন্ত জঙ্গম, এবং সারা দেশের জীবনযাপনও একই ছাঁচে ঢালাই করা; তবু সেখানে শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ সম্পূর্ণ স্বাধিকার-সম্পন্ন। এই স্বাধিকারলাভের স্বাভাবিক দাবি বিভিন্নভাষী ভারতীয় প্রদেশগুলির বহুগুণে বেশি।

অবশ্য কোনো আধুনিক শক্তি-সম্পন্ন রাষ্ট্র উদগ্র বল প্রয়োগ দ্বারা একই ভাষার প্রচলন ক'রে ভারতীয় জাতিগুলিকে একটা যান্ত্রিক 'নেশনে' পরিণত করতে পারে না তা নয়; আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে কী-পরিমাণ দুর্ধর্ষতা সম্ভব, তার হৃদয়বিদারক উদাহরণের অভাব নেই। কিন্তু যে-সান্নিধ্য বলের দ্বারা সাধিত হ'য়ে বাধ্যতার ফলে টিঁকে থাকে, তা নিষ্প্রাণ ব'লেই নিতান্ত মূল্যহীন। জেলখানার একটা ঘরের মধ্যে দশজন কয়েদির স্থান হ'তে পারে, তারা একই রকম খায়, পরে ও কাজ করে, কিন্তু সেই নৈকট্যকে মিলন বলে না। মিলন ঘটে নিমন্ত্রণসভায়, যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় আসে, যেখানে সাধারণ সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে তার দেহ-মনের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে, যেখানে প্রীতি ও আনন্দের বিনিময়ে মানুষের চিত্ত প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে। আর তাছাড়া, ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই যদি লক্ষ্য হয় তাহ'লে এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রীতির পথেই ভাবতে হবে আমাদের; যা নিতান্ত বলপূর্বক সাধিত হয় তার আয়ু কত ক্ষণিক এবং তা মরবার আগে কত বড়ো সর্বনাশ ক'রে

যায়, তারও প্রমাণ সাম্প্রতিক একনায়কেরা সুপ্রচুরভাবে দিয়ে গেছেন।

অতএব রাষ্ট্রভাষার প্রবর্তন বা প্রচলন দ্বারা কোনো সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান হবে না। বরং, রাষ্ট্রভাষা অত্যন্ত বেশি উদ্ধত হ'য়ে উঠলে তা অন্যান্য ভাষার পরিণতির পথে কঠিন অন্তরায় হবে। ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক অসাম্য রয়েছে, তার নিরসন প্রত্যেক প্রদেশবাসীর আপন দায়িত্ব ব'লে মনে করা চাই। কোনো ভাষার সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞাপন তার সাহিত্য, তার পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তি নয়। উনিশ শতকে, রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজ যখন ফরাশি ভাষাকে প্রেমের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো, তখন ফ্রান্সে বুরবঁ বংশের বিলোপ ঘ'টে গেছে, নেপোলিয়নের আক্রমণের স্মৃতিও মুছে যায়নি, কিন্তু ফ্রান্সের সাহিত্য সহস্র শিখায় ভাস্বর। ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা পারস্য ভাষা ভুলে গেলাম, কিন্তু ইংরেজ চ'লে যাবার পরেও ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের দুর্মর আসক্তির কারণই এই যে এই ভাষায় আধুনিক কালের মননশক্তি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জগতে বহু লোক ব্যবসায়িক কারণে ইংরেজি বা ফরাশি শিখে থাকেন, কিন্তু এ-কথা ভাবলেও ভুল হবে যে বহুবিস্তৃত বাণিজ্য বা রাজনৈতিক প্রতিপত্তির জন্যই ওদুই ভাষা বিস্তার লাভ করেছে। ব্যবসা চালাবার জন্য হাজার-খানেক শব্দ-সংবলিত পরিভাষা শিখলেই চলে, তাকে ভাষাশিক্ষা বলে না। ফরাশি বা ইংরেজি ভাষা জগতের মধ্যে যে-প্রচার ও সম্মান লাভ করলো, তার আসল কারণ তাদের বিরাট, ঐশ্বর্যশালী ও নিরন্তর সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও শিল্পকলা, এবং সেই ভাষাদ্বয়ের সর্বাঙ্গীণ ও সুপরিণত প্রকাশক্ষমতা। এই আকর্ষণ না-থাকলে শুধু সাম্রাজ্যবলে এত বড়ো প্রসারলাভ সম্ভব হ'তো না। য়োরোপীয় মহাদেশে ফরাশি-ভাষা প্রায় সামান্য ভাষার মতো কাজ করে, মিশরে ও ইরানেও তা প্রচলিত; তার কারণ ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রবলতা নয়, তার সাংস্কৃতিক মর্যাদা। এবং শুধু শেক্সপীয়র মূল ভাষায় পড়ার জন্য জগৎ ভ'রে বহু সুধীজন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ক'রে থাকেন।

কিন্তু সব মানুষ ভাষাবিদ্ হ'তে পারে না, অধিকাংশের পক্ষে একাধিক ভাষাও ভালো ক'রে শেখা দুরূহ। বিভিন্ন

দেশের সাহিত্যের অর্থাৎ চিত্তের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যদি প্রত্যেকবার একটি নূতন ভাষা শিখতে হ'তো, তাহ'লে মানবসভ্যতায় বিনিময় ব'লে কিছু থাকতো না। এই বিনিময়ের জন্য যে-উপায় মানুষ আবিষ্কার করেছে, তার নাম অনুবাদ। অনুবাদ সেই ভিত্তি, যার উপর য়োরোপে, এবং আটলান্টিকের দুই তীর জুড়ে, এক মহৎ, বলিষ্ঠ সাহিত্যসমাজ গ'ড়ে উঠেছে। য়োরোপের যেকোনো দেশে কোনো নূতন ও বরেণ্য লেখক দেখা দিলে তাঁর রচনা অন্যান্য ভাষায় অচিরেই অনূদিত এবং আলোচিত হবে, জন্মভূমিতে আবদ্ধ না-থেকে য়োরোপীয় ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি গৃহীত হবেন। রাশিয়ার রুদ্ধ দ্বার প্রথম খুলে দিলেন পিটার দি গ্রেট, কিন্তু সে-দেশ যথার্থভাবে য়োরোপীয় মানসের অন্তর্গত হ'লো টলস্টয় প্রভৃতি সাহিত্যিকেরই প্রভাবে। তেমনি, ইবসেনের সঙ্গেই স্ক্যাণ্ডীনেভীয় দেশগুলির য়োরোপীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ। একজন ইবসেন, একজন দান্নুনৎসিয়ো, একজন টমাস মান্ স্বকীয় ভাষার প্রচারের জন্য যা করতে পারেন, কোনো রাষ্ট্রশক্তির সে-ক্ষমতা নেই। বাঙালি, ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রতি বিমুখ ব'লে অভিযোগ শোনা যায়, কিন্তু এ-কথাও ভেবে দেখা দরকার যে অন্যান্য ভাষা জানবার সত্যিকার সাহিত্যিক প্রেরণা কতটুকু আছে, এবং ভারতের সকল ভাষায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রচুর ও পৌনঃপুনিক অনুবাদ হবারই বা কারণ কী। বাংলায় উনিশ-শতকী নবজীবনের পরে, রবীন্দ্রনাথের পরে, সক্ষম ও পরিণতিপ্রবণ বিশ-শতকী সাহিত্যেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সনাতন সাহিত্য বা সনাতনী সাহিত্য পড়ার জন্য কোনো জীবিত ভাষা শিক্ষণীয় হয় না, ভারতের সব ভাষাতেই রামায়ণ, মহাভারত, বাউল-সংগীত, পল্লীগীতিকা লেখা হয়েছে। জীবিত ভাষার কাছে আমরা চাই নূতন ভাব, নূতন রীতি, উদ্যমের সাহস। ইবসেন যদি পুরোনো নর্স সাগারই পুনরাবৃত্তি করতেন তাহ'লে য়োরোপে তাঁর কোনো আসন হ'তো না। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যেদিন সৃষ্টিশীল, আধুনিক ও বিশ্বচেতন সাহিত্য দেখা দেবে, গ'ড়ে উঠবে বিভিন্ন প্রদেশে সাংস্কৃতিক পরিণতির সমতা, তখন পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও বিনিময় হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনিবার্য,

তার জন্য কোনো হিতোপদেশের প্রয়োজন হবে না। বলা বাহুলা, এই কাজটি কোনো সরকারি দপ্তরের দ্বারা সাধিত হতে পারে না, প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে সহজভাবেই সৃষ্টির উদ্যম জেগে ওঠা চাই। সেই জাগরণের লক্ষণ আজ ভারতে দেখা দেয়নি তা নয়; কিন্তু এই সময়ে, কোনো রাষ্ট্রিক কারণে, যে-কোনো ভারতীয় ভাষার স্বাধিকার বিপর্যস্ত হ'লে সেটা হবে সর্বভারতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত।

এখন ভেবে দেখা যাক বাংলাদেশের মধ্যে বাঙালি লেখক বা শিল্পীর অবস্থা কী।

এখানেও, দৃষ্টিপাতমাত্রেই, খেদজনক দৃশ্য চোখে পড়ে। যেমন ভারতের বিভিন্ন অংশের অসমান পরিণতির ফলে কোনো ভারতীয় সাহিত্যসমাজ গ'ড়ে উঠতে পারছে না, তেমনি বাংলার বিভিন্ন কর্মবিভাগেও প্রখর ব্যবধান সংহতির অন্তরায় হয়েছে। এই ব্যবধান কোনো পক্ষের দুর্মতিপ্রসূত নয়, বিভিন্ন শিল্পব্যবসায়ে বৃদ্ধির স্তরভেদেই তার কারণ। পশ্চিমীছাঁচের নাট্যশালা বাংলাদেশেই প্রথম গ'ড়ে উঠলো, আজকের দিনেও ভারতের অন্য কোনো

নগরে তার তুলনীয় বিস্তার ঘটেনি। এ নিয়ে আমরা গর্ব ক'রে থাকি—করতেও পারি—কিন্তু বাংলা নাট্যশালা তার শতাধিক বর্ষের ইতিহাস নিয়ে আমাদের চিত্তকে যথার্থভাবে কতটুকু পুষ্ট বা উদ্বুদ্ধ করেছে, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লে দু-একজন পথিকৃতের নামোল্লেখের পরেই স্তব্ধ হ'তে হয়। উনিশ শতকের অবসানের পরেই নাট্যশালার সৃষ্টির উদ্যম ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো; তারপর শক্তিশালী নটনটী, প্রয়োজক ও পরিচালক আমরা পেয়েছি, কিন্তু যে-নাটকসমূহ অবলম্বন ক'রে তাঁরা আসর জমালেন সেগুলো অভিনয়ের উপযোগী হলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হ'তে পারলো না। প্রাক্-বিপ্লব মস্কোতে যেমন নাট্যশালা সাহিত্য-শিল্পকলার একটি বৃহৎ ও প্রাণবন্ত কেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, এবং ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে বহুকাল ধ'রে তা-ই আছে, যেখানে দেশের গুণীসমাজের নিত্য যাওয়া-আসা, বিভিন্ন বয়সের ও গোষ্ঠীর সাহিত্যিকের ভিড়, যেখানে যুগে-যুগে নতুন ভাবের নাট্যকার, সনাতনীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আপন প্রতিভাকে নির্ভয়ে এবং সবলে ফুটিয়ে তুলতে পারেন—সে-রকম কিছুই কলকাতায় কখনো দেখা গেলো না, না শিশিরকুমারের রাজত্বকালে না আজকের দিনের সুদক্ষ শৌখিন দলের প্রচেষ্টায়। আমাদের নাট্যশালার অদ্ভুত ব্যর্থতা এই যে এখানে অভিনেতা হ'লো, মঞ্চসজ্জা হ'লো, দর্শকমণ্ডলীরও অভাব হ'লো না—কিন্তু হ'লো না শুধু নাটক। গত কুড়ি বা পঁচিশ বছরের মধ্যে যে-ক'টি নাটক উজ্জ্বলভাবে অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে (পুরোনো লেখা বাদ দিয়ে) অধিকাংশই জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ, অন্যগুলি যান্ত্রিকভাবে নির্মিত, অন্তরের প্রেরণায় উৎসারিত নয়। রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিশ-শতকী বাংলার একমাত্র মৌলিক নাট্যকার, তাঁর বিখ্যাত প্রহসন দুটি গৃহীত হ'য়ে থাকলেও অন্যান্য এবং মহত্তর নাট্যরচনাকে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ সভয়ে বর্জন ক'রে এসেছেন। সে-সব রচনার মাঝে-মাঝে অভিনয় করেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ, বা কোনো-কোনো আধা-শৌখিন সম্প্রদায়; সেই অভিনয় অত্যুৎকৃষ্ট হ'লেও তার দ্বারা কোনো স্থায়ী ফললাভ সম্ভব নয়; অভিনয়ের কোনো স্থায়ী এবং সর্বসাধারণিক ব্যবস্থার অভাবে 'ডাকঘর', 'রাজা', 'নটীর পূজা' অথবা নৃত্যনাট্য-গীতিনাট্যগুলো, আজ পর্যন্ত 'শৌখিনতা'র অপবাদ কাটিয়ে উঠতে পারলো না, এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকলো। এ-ক্ষেত্রেও, অন্য অনেক বিষয়ের মতো, শান্তিনিকেতন আমাদের নিরাশ করেছে।

উপরন্তু, আমাদের নাট্যশালা পুরোনো পল্লীজীবনের ধ্যান-ধারণার মধ্যেই নিশ্চল হ'য়ে আছে; তার সামাজিক নাটকে আধুনিক চিত্ত প্রতিফলিত হয় না, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে সমসাময়িক ভাবনাজনিত নতুন অর্থ উদ্ভাসিত হয় না, এবং যেখানে বর্তমান কালের চিত্রণ থাকে তাও বিকৃতভাবে, অক্ষমভাবে, কিংবা সাংবাদিক বিবরণের ধরনে। মোটের উপর দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য আর নাট্যশালা উনিশ শতকের সহযাত্রী হ'য়েও ইদানীং বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে; আমাদের সাহিত্য তার অব্যাহত পরিণতির ধারায় আজ যেখানে এসে পৌচেছে সেখানে নাট্যশালার

সঙ্গে তার কিছুই মিল নেই। আজকের দিনে বাংলাদেশে নবীন সাহিত্যপ্রয়াসীর অভাব নেই, কিন্তু তাদের সকলেরই উচ্চাশার লক্ষ্য কবিতা বা কথাসাহিত্য। কোনো যুবক মনে-মনে বলে না, 'আমি নাটক লিখবো'; এবং যাঁরা সাধারণত সাহিত্যচর্চা ক'রে থাকেন তাঁদের মধ্যে নাটকের দর্শকসংখ্যাও অত্যল্প।

সত্য, তাঁরা থিয়েটারে না-গেলেও অনেকেই মাঝে-মাঝে সিনেমায় যান, কিন্তু তার কারণ বাংলা সিনেমার উৎকর্ষ নয়। তার কারণ, অর্থ ও সময়ের দিক থেকে সিনেমায় খরচ কম, কলকাতায় প্রতি অঞ্চলেই সিনেমাগৃহ আছে আর সেগুলো প্রীতিকর এবং প্রত্যহ অধিগম্য। উপরন্তু, চলচ্চিত্র ছায়ামাত্র হ'লেও তার চাকচিক্য, জৌলুষ বা গ্ল্যামর সর্বত্রই প্রবল। কিন্তু আন্তরিক বিচারে বাংলা সিনেমা বাংলা থিয়েটারের মতোই প্রাচীনপন্থী; তাতে আধুনিকতার আশবাবপত্র অনেক পাওয়া যায়, কখনো বা উন্মত্ত আকারেও, কিন্তু পাওয়া যায় না ভাবনার সাহস বা কল্পনার নূতনত্ব। এখানেও, নাটকের মতোই, দুঃশীলা স্ত্রী সতীলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হন, পারিবারিক সদুপদেশের হরিলুট প'ড়ে যায়, তরুণ-তরুণীর প্রণয়োদ্গম আবেগহীন প্রগল্ভতায় দুঃসহ হ'য়ে ওঠে—এবং অনেক সময় এই সবই ঘ'টে থাকে মূল লেখকের অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন ক'রে। এই সব দোষ যেখানে উল্লেখ্যভাবে থাকে না, সেখানেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিষয়ের অসারতার জন্য অন্য সবই ব্যর্থ মনে হয়। এতৎসত্ত্বেও শিক্ষিত, বয়স্ক, পুস্তকপাঠক পুরুষ যে মাঝে-মাঝে সিনেমায় যান তা শুধু অবসর কাটাতে,

ঠাণ্ডা ঘরে বিশ্রাম নিতে, হয়তো গান শুনতে, হয়তো তাঁদের স্ত্রীদের প্ররোচনায়। কোনো প্রিয় মুখ পুনর্বার দর্শনের ইচ্ছাও একটা কারণ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কেননা নায়িকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্যামেরা যেভাবে প্রকট ক'রে তোলে রঙ্গমঞ্চের রক্তমাংসের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তত্রাচ, বাংলা সিনেমার দর্শকদের মধ্যে নারী, কিশোর আর অশিক্ষিতের তুলনায় বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা এখনো অকিঞ্চিৎকর।

আমি জানি, 'পথের পাঁচালী'র পর বাংলা সিনেমা শ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠেছে, সুধীজনের পূর্ণ অভিনন্দনযোগ্য প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র এটি, এবং এটি যে সম্ভব হ'তে পারলো তাতে আমরা বাংলার অন্তর্নিহিত মৌলিক সৃষ্টিশীলতার নূতন প্রমাণ পেলাম। কিন্তু একটি বিহঙ্গেই বসন্তকাল সূচিত হয় না, এবং 'পথের পাঁচালী'কে যুগান্তরকারী ব'লে ঘোষণা করার আগে আমরা ততদিন অপেক্ষা করবো, যতদিন এর সঙ্গে তুলনীয় বাংলা সিনেমা আমরা আরো দেখতে না পাই, এবং এই ব্যবসায়ের মানসতায় সাবিক পরিবর্তন না ঘটে। তাছাড়া আমার উদ্দেশ্য এখানে চলচ্চিত্রের আলোচনা নয়, বাংলার বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে সম্বন্ধ বা সম্বন্ধের অভাব দেখানো। সিনেমা, আজকের দিনে, বাঙালি কথাসাহিত্যিকের পক্ষে জীবিকার একটি লোভনীয় উপায় হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তাই ব'লে এই দুই শিল্পে কোনো হার্দ্য বন্ধন স্থাপিত হয়নি। যে-সম্বন্ধ কেবলমাত্র আর্থিক সেটা কোনো সম্বন্ধই নয়। পক্ষান্তরে, কোনো প্রতিষ্ঠান শিল্পীকে কিছু অর্থমূল্য দিয়ে যদি তাঁর বা তাঁর রচনার চরিত্র নষ্ট করে, তাকে, সত্যিকার শিল্পী হ'লে, তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। আমাদের নাট্যশালার সঙ্গে সাহিত্যের যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা দুঃখের, কিন্তু চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই বিক্ষুব্ধ ও নিতান্ত অর্থনির্ভর সাযুজ্য রীতিমতো পীড়াদায়ক।

গানের ক্ষেত্রে ছাড়া, কলকাতার রেডিও আমাদের মানসে কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। নামত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হ'লেও তার সম্প্রচার অচির-বিস্মরণ-যোগ্য প্রমোদের স্তরেই আবদ্ধ হ'য়ে আছে। অবশ্য রেডিও একটি স্বতন্ত্র আর্ট নয়, কখনো হ'তেও পারে না; তা বিকিরণের একটি ব্যাপক উপায় মাত্র; সংগীত, অভিনয় ও সাহিত্যের মতো অন্যান্য শ্রোতব্য শিল্পকে ব্যবহার ক'রে সে পরাশ্রিত জীবিকানির্বাহ করে। তার উপর ভারতীয় রেডিও স্বাধীন নয়, একান্তভাবে সরকার-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তার উপদেষ্টারাও সাধারণত রক্ষণশীল; তাই রেডিওর সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপ এ-যাবৎ উল্লেখযোগ্য হয়েছে শুধু সাবধানতা আর গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তির জন্য। সাহিত্য বা সাহিত্যিকের সঙ্গে যেটুকু সংযোগ তার ঘটেছে তা না-ঘটলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না; সকলেই গান শোনার জন্য রেডিও কেনে, আর সেই গানও আবহ-সংগীতের মতো ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে—গৃহকর্মের সময়

মহিলারা, চুল ছাঁটার সময় পরামানিকগণ এবং নানা শ্রেণীর দোকানদারবর্গ যে-ভাবে এবং যে-কারণে রেডিও খুলে রাখেন, তাতে আলাপ-আলোচনা ও কবিতাপাঠ নিতান্ত অবান্তর ব'লে বোধ হয়। উপরন্তু, এই সব অনুষ্ঠান বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত, তার পিছনে কোনো স্পষ্ট ও গঠনশীল উদ্দেশ্য নেই, কোনো মূল্যবোধও নেই ; উৎকৃষ্টের পাশেই সেখানে নিকৃষ্টের স্থান হ'য়ে থাকে, দৈবাৎ উৎকৃষ্ট কিছু ঘটলে সম্ভাব্য উৎসাহীরা সব সময় তা জানতে পারেন না, এবং মোটের উপর সাহিত্যের জন্য যেটুকু সময় ব্যয়িত হয়, তাও, বাংলা সাহিত্যের সম্পদ ও গতিশীলতার তুলনায়, নগণ্য।

অবশ্য রেডিও বা টেলিভিশন সব দেশেই সাধারণ্যের পরিবাহক—এই যন্ত্রশক্তির বিশেষ দক্ষতাই সেই দিকে। পশ্চিমী দেশে ঘরে-ঘরে রেডিও থাকলেও মনোযোগী শ্রোতার সংখ্যা বেশি নয় ; সেখানেও তার প্রধান ব্যবহার পানশালার আমোদবর্ধনে। তবু ইংলণ্ড বা আমেরিকার রেডিও ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা বেশি আলোকপ্রাপ্ত ; ব্যবসায়ীর দ্বারা পরিচালিত মার্কিন রেডিও বিজ্ঞাপনের ভিড়ে বাংলা ভাষার শারদীয় সংখ্যার মতো হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে-দেশেই অন্য অনেক ক্ষুদ্রতর অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে (তার কোনো-কোনোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত), যারা নির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য সংসাহিত্যের প্রচারে সচেষ্ট। এই কেন্দ্রগুলিতে কোনো লেখক বা পণ্ডিতকে (তিনি বিদেশী হ'লেও) মাইক্রোফোনের সামনে আহ্বান ক'রে বলা হয়, 'নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন।' পৃথিবীর অন্য কোথাও বক্তার এই স্বাধীনতা আছে কিনা জানি না।

ইংলণ্ডের রেডিওতে কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কিছুটা বেশি হ'তে পারে, কিন্তু বি. বি. সি. র 'তৃতীয় অনুষ্ঠানে'র সাহিত্যচর্চা সপ্রাণ ও গঠনশীল ব'লে তাকে উন্নত স্বদেশসমাজও উপেক্ষা করতে পারেন না। আবৃত্তি এবং আলোচনার দ্বারা সমসাময়িক কাব্যের প্রচারে এই অনুষ্ঠান যে-ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কলকাতার অমনোযোগের তুলনা হয় না। কলকাতার রেডিও আজ পর্যন্ত কোনো ডিলান টমাসকে আবিষ্কার করেনি, আধুনিক সাহিত্যকে উজ্জ্বল ও নূতনভাবে উপস্থিত করারও কোনো চেষ্টা করেনি—যদিও এর জন্যে উপযোগী উপাদানের অভাব নেই।

অন্য একটিমাত্র শিল্পের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ঘটতে পেরেছে ; সেটি চিত্রকলা। কথাটা লিখেই কলম থামিয়ে একটু ভাবতে হ'লো, কেননা, সত্যি বলতে, এ-দুয়ের মধ্যেও কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ এখনো স্থাপিত হয়নি, মাঝে-মাঝে শুধু কবি ও চিত্রক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অজন্তার নারী, কালিদাসের নায়িকা, এবং সংস্কৃতে রাগ-রাগিণীর রূপবর্ণনা —এ-সব যেমন একই জগতের ও একই মানসের প্রামাণিক সৃষ্টি ; আধুনিক য়োরোপে, বিশেষত প্যারিসে, যেমন এ-দুই শিল্প পরস্পরের সহযোগে উভয়েই বলীয়ান ও বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে—সাম্প্রতিক বাংলায় সে-রকম বিনিময় এখনো ঘ'টে উঠলো না। অবস্থাটা আরো বেশি অদ্ভুত ও বেদনাদায়ক ব'লে বোধ হয়, যখন ভাবি যে কলকাতায় একই বাড়িতে, এবং প্রায় একই সময়ে, আমাদের সাহিত্য ও চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিলো। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ছবি, মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

থেকে বিষয় আহরণ করলেও, আদর্শে ছিলো বিপরীত ; আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, যখন 'বলাকা', 'লিপিকা' লেখা হ'য়ে গেছে, 'সবুজপত্রে'র অবসানের পরে 'কল্লোলে'র কণ্ঠ প্রায় শোনা যাচ্ছে, তখনো অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের আঁকা ছবি দেখে মনে হ'তে পারতো দেশের কাব্য মোগল আমলের রাখালি সুরেই আবদ্ধ আছে। কোনো-একপ্রকার ক্ষণিক সেতুবন্ধ সম্ভব হয়েছিলো গগনেন্দ্রনাথের হাতে ; তাঁর ছবি, আর রবীন্দ্রনাথের গূঢ় কাব্য ও রূপক-নাট্য, এ-দুয়ের জগৎ অত্যন্ত বেশি দূরবর্তী নয়। এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবিতে তাঁর স্বপ্নলোক তাঁর কাব্যের চেয়েও দূরতর একটি দিগন্ত খুলে দিলো। তাঁর ছবি দেখে আমরা বুঝলাম, শান্তিনিকেতনের প্রধান পুরুষ শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পরিপোষক নন ; আরো দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ আজীবন নীলরক্তবান লেখক হ'লেও, তাঁর ছবিতে লাল রক্ত দপদপ্ ক'রে জ্বলছে। কিন্তু তিনি নিয়মাবদ্ধ, পেশাদার চিত্রকর ছিলেন না ব'লে ছবির জগতে পথনির্দেশক হলেন না ; তাঁর চিত্রের গুণগ্রাহীর

মধ্যে সাহিত্যিকের সংখ্যাই বোধহয় বেশি। যামিনী রায় বর্তমান ভারতের প্রধান শিল্পী, তাঁর সৃষ্টির ও জীবনের চারিত্র সাহিত্যিকের অভিনন্দন পেয়েছে, তাঁর ছবি দেখা ও কথা শোনা বাঙালি লেখকের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও আধুনিক কবির ভাবনার সাযুজ্য নেই। কেননা তাঁর ছবির গুণ শুদ্ধতা, সরলতা ও স্থৈর্য ; এদিকে কবিরা ভালবাসেন দ্বন্দ্ব, গতি ও জটিলতা। মোটের উপর, আমাদের সাহিত্য আর চিত্রকলার সংযোগ এখনো আকস্মিকতায় আবদ্ধ রয়েছে ; তার কোনো সুস্পষ্ট ধারা দেখা যাচ্ছে না, এবং এ-দুয়ের মধ্যে নিরন্তর ফলপ্রসূ বিনিময় কতদিনে সম্ভব হবে, তা অনুমান করার কোনো উপায় নেই।

উপরন্তু, বাংলাদেশের লেখকরাও বিভক্ত। আমি জানি, সব দেশের লেখকরাই তা-ই ; কিন্তু এ-দেশে শিক্ষিত পাঠকসংখ্যা অত্যল্প ব'লে, এবং সমালোচনার কোনো আদর্শ নেই ব'লে, যে-রকম বিভ্রান্তি নিত্য দেখতে পাওয়া যায় তাকে ব্যভিচার বললে ভুল হয় না। বিভেদজনিত কুফল যদি ঠেকাতে হয়, তার উপায়ই হ'লো বিভেদটাকে স্বীকার ক'রে নেয়া। এই স্বীকৃতি, যা পশ্চিমী দেশে অবধারিত, তাকে যে আমরা উপেক্ষা ক'রে থাকি তার কারণ আমাদের সহৃদয়তা নয়, মূল্যবোধের দারুণ অনটন। পাঠকের পার্থক্য অনুসারে য়োরোপীয় লেখকদের মধ্যে জাতিভেদ গ'ড়ে উঠেছে ; একই লেখক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পাঠকের খিদে মেটান না, এবং উভয় শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে একই লেখকের বা একই পত্রিকার প্রচার হবার উপায় নেই। উত্তর ইংলণ্ডের একটি যন্ত্রবহুল নগরের সাধারণ পাঠাগারগুলিতে অন্বেষণ ক'রে "টাইমস সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে"র একজনও পাঠক পাওয়া যায়নি ; এবং 'হরাইজন' পত্রিকা ঐ অঞ্চলেই ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি পাঠিয়ে একজন মাত্র গ্রাহক লাভ করেছিলেন। আমাদের অবস্থাটা ওরই কাছাকাছি ব'লে আক্ষেপ করি না, পুরোপুরি ও-রকম নয় ব'লেই দুঃখ করি। ইংলণ্ডে একই পাঠক এথেল এম. ডেল ও ভর্জিনিয়া উলফের উপন্যাস পড়েন না ; ফলত কোনো পাঠক (বা সমালোচক) এক নিশ্বাসে ও-দুই লেখকের নামোচ্চারণ থেকেও বিরত থাকেন। সেটা মস্ত বাঁচোয়া। বাংলা দেশে পাঠকদের মধ্যে শ্রেণীবিভেদ দেখা দেয়নি তা নয়, কিন্তু সেটা এখনো স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়নি ব'লে সাহিত্যচিন্তা ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। এখানেও, যাঁরা শুধু কবিতা লেখেন (পাঠ্যপুস্তকের পদ্য নয়), তাঁদের নাম মফস্বলে বা বৃহত্তর পাঠকসমাজে পৌঁছয় না ; কলকাতার অধিবাসী এম. এ. পাশ চাকুরে, অথবা তাঁদের পঠনপ্রিয় পত্নীগণ, তাঁরাও অনেকে জীবনানন্দ দাশের নাম প্রথম শোনেন তাঁর মৃত্যুর পরে, তাও 'জীবানন্দ' রূপে। এগুলো মনঃক্ষুণ্ণকর হ'তে পারে, কিন্তু মর্মান্তিক নয়। মর্মান্তিক ব'লে তাকেই, যখন একই ব্যক্তি 'পদ্মানদীর মাঝি' ও মোহন-সিরিজের উপন্যাস (অথবা তার রাজ-সংস্করণ) সমান উৎসাহে পাঠ ক'রে থাকেন, কিংবা কোনো সমালোচক সাহিত্য ও অসাহিত্যের প্রভেদ বোঝেন না, বা বুঝলেও স্বীকার করেন না। 'পদ্মানদীর মাঝি' মুদ্রিত গ্রন্থ, মোহন-সিরিজও তা-ই ; অতএব দুটোই 'সাহিত্য' ; উভয় গ্রন্থকার কাগজের উপর অক্ষর এঁকেছেন, অতএব দু-জনেই 'লেখক' এবং একই সঙ্গে আলোচনার যোগ্য। লেখক ও পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে, এই মূঢ়তাও ভীতিকরভাবে বিবর্ধমান।

এ-দেশে যন্ত্রযুগের সংঘাত এখনো ব্যাপক নয়, অক্ষৌহিণী পাঠকও গ'ড়ে ওঠেনি ; তাই সংসাহিত্য ও গণসাহিত্যের যে-বিভেদ অন্যত্র তর্কাতীত, আমাদের মধ্যে এখনো তা প্রতিষ্ঠা পেলো না। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বিভেদকে আমি অন্যভাবে চিহ্নিত করতে চাই ; যে-দুটি পৃথক ধারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাদের নাম দিতে চাই 'দেশজ' ও 'দেশোত্তর।' (পাশাপাশি এই শব্দ দুটি জীবনানন্দ দাশের একটি প্রবন্ধে সেদিন চোখে পড়লো, আমি আমার অভিপ্রায় অনুসারে ভিন্নভাবে ব্যবহার করছি। (বলা বাহুল্য, যে-রচনা সাহিত্য ব'লে গণ্যই হ'তে পারে না, তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই ; যাঁদের আমরা 'ভালো লেখক' ব'লে থাকি তাঁদেরই মধ্যে বিভেদ আমার আলোচনার লক্ষ্য। 'দেশজ' বলছি তাঁদের যাঁরা লৌকিক ধারার একান্ত অনুগামী ; যাঁরা পুষ্টি অথবা প্রেরণার জন্য দেশের বাইরে দৃষ্টিপাত করেন না, এবং যাঁরা ধর্ম, নীতি ও সমাজ বিষয়ে সর্বসাধারণে প্রচলিত ধারণাগুলোর সমর্থন বা প্রচার ক'রে থাকেন। এঁদের পাঠকসংখ্যা স্বভাবতই বেশি এবং রচনায় চেতনার

চেয়ে স্বভাবের কাজ বেশি দেখা যায়। আর যাঁরা স্বল্পপঠিত এবং স্বল্পসংখ্যক 'দেশোত্তর' লেখক, তাঁরা আত্মচেতন ও বিশ্বচেতন; বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় দাঁড় করাবার জন্য নিরন্তর প্রয়াসী তাঁরা। এঁদের মধ্যে কবি ও প্রাবন্ধিক বেশি, কখনো কেউ কথাসাহিত্যে সচেষ্ট হ'লেও আদৃত হন না, এবং ঐতিহ্যরক্ষার বদলে ঐতিহ্যের পরিবর্তন যেখানে ঘটেছে, তাও রবীন্দ্রনাথের পরে উল্লেখ্যভাবে এঁদেরই হাতে। কিন্তু, দেশোত্তর ব'লেই, এঁদের অবস্থার মধ্যে সংকট আরো প্রখর; এঁদের মনোলোক বিশ্ব হ'লেও অব্যবহিত কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশ মাত্র; যে-পশ্চিমে মানবসভ্যতার আধুনিক প্রকরণটির উদ্গম ও পরিণতি ঘটলো, তার গতিশীল চিত্তের সঙ্গে এঁরা যুক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু বিনিময় করতে পারেন না। পারেন না, তার প্রধান কারণ বিনিময়ের রাস্তা এখনো তৈরি হয়নি। এবং বিনিময় ব্যতীত কোনো সংশ্রব বলীয়ানভাবে, প্রচুরভাবে, ধারাবাহিকভাবে সফল হ'তে পারে না।

আমি এই বাঁধা বুলি আওড়াতে চাই না যে মহৎ লেখক-মাত্রেই একাধারে দেশজ ও দেশোত্তর, কিংবা তার উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উল্লেখেরও আমি প্রয়োজন দেখি না। এ-সব কথা এতই সত্য যে আজকের দিনে না-বললেও চলে। আজকের দিনে, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির পারস্পরিক অভিঘাত দৈনন্দিন ঘটনা হ'য়ে উঠলো, তখন 'দেশজ' ও 'দেশোত্তর' শব্দ ছুটিতেও নূতন অর্থ প্রবেশ করেছে। কালিদাস, দান্তে বা শেক্সপিয়র যে-অর্থে বিশ্বজনীন কবি, 'দেশোত্তর' শব্দটিতে সে-অর্থ দিলে ভুল হবে। সারা বিশ্বের শিল্পকলা ও তার ইতিহাস আধুনিক শিল্পীর অধিগম্য—শুধু স্বদেশের বা প্রতিবেশী দেশের নয়, আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীর। আমরা যেন ভুলে না যাই যে এটি বিশ শতকের একটি যুগান্তরকারী ঘটনা, এমন বিপুল বিচরণক্ষেত্র অতীতের শিল্পীরা কল্পনাও করেননি। অতএব আধুনিক শিল্পে দেশোত্তরতা শুধু যে বহুলভাবে সম্ভব হয়েছে তা নয়, প্রায় শিল্পের যাথার্থ্যের একটা শর্ত হ'য়ে উঠেছে; অমিশ্র বা স্বল্পমিশ্র দেশজ ধারাতে তৃপ্তি আছে শুধু সে-সব দেশে, যেখানে বিশ্বের ঢেউ এখনো তেমন প্রবলভাবে আঘাত করেনি। শেষের কথাটা বাংলাদেশ বিষয়েও সত্য, আর সেটা একটা কারণ যার জন্য দেশোত্তর বাঙালি লেখককে ছুরূহ বাধা ঠেলে চলতে হয়। বিশ্বের কাছে উপস্থিত হবার যে-সহজ সুযোগ চিত্রশিল্পীর আছে লেখকের তা নেই; কোনো প্রতিভাশালী বাঙালি শিল্পী যদি যুবাবয়সে প্যারিসে চ'লে যান, এবং সেখানেই কর্মিষ্ঠভাবে বহুকাল যাপন করেন, তাহ'লে ফরাশি চিত্রকলার ঐতিহ্যের মধ্যেই বিধৃত হ'তে পারেন তিনি, যদিও তাঁর রচনার আকাশে—পিকাসোর স্পেন বা শাগালের রাশিয়ার মতো—বাংলাদেশের বিদ্যুৎও ঝিলিক দেবে। কিন্তু লেখক তাঁর মাতৃভাষার কাছে জন্মের মতো বিকিয়ে আছেন; তাঁর ধর্ম, আচার, ব্যবহার, বাসভূমি, সবই তিনি বদলাতে পারেন, কিন্তু ভাষা তাঁকে অমোঘভাবে ধ'রে রাখে। দৈবাৎ একজন জোসেফ কনরাড সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ও-রকম ব্যতিক্রমের জন্য যে অস্বভাবী ঘটনাচক্রের প্রয়োজন হয়, এই অতি জঙ্গম বিশ শতকেও তা একবারের বেশি দেখা যায়নি। বৈশ্বিকভাবেই এ কথা সত্য যে মানুষের আত্মা বা নির্জ্ঞান মন শুধু সেই ভাষাতে কথা বলতে পারে, যে-ভাষা সে অজ্ঞান বয়সে শিখেছে, এবং যার পরতে-পরতে মিশে আছে তাঁর নিজের শৈশব ও প্রথম যৌবন, আর পূর্বপুরুষের জীবনধারা। তাঁর ভাষার সীমানার জন্য, বাঙালি লেখকের বিশ্বক্ষুধাও অতৃপ্ত থেকে যায়।

মোটের উপর দাঁড়িয়েছে এই যে বাঙালি লেখক আজ সব দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ; তাঁর কোনো সমাজ নেই, সংসর্গ নেই, আবহাওয়া নেই, তাঁর রচনা যাচাই করার, গ্রহণ করার, প্রত্যাখ্যান করার কোনো প্রাণবন্ত পরিমণ্ডল নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ, বহুপূর্বেই নিরাপদে এবং নিঃসংশয়ে প্রেতলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে; এবং, বলা বাহুল্য, নতুন সরকারি আকাদমি বা সরকারি পদবী ও পুরস্কার সমূহ দ্বারা প্রচারকার্য অগ্রসর হ'তে পারে, বা লেখক বা তাঁর পরিবারবর্গ সাংসারিক অর্থে উপকৃত হ'তে পারেন, কিন্তু এই উপায়ে সৃষ্টির উৎসাহ কখনোই জাগতে পারে না। বরং, কালক্রমে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের উপরে এ-সব সংঘের

ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে; লেখা হ'তে পারে, রাশিয়ার মতো, উপন্যাসের নামে পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের বিবরণ বা ছত্রপতির বন্দনা ক'রে কবিতা। ইদানীং যে-সব দেশে রাজশক্তি শিল্পকলার পরিপোষক হ'য়ে উঠেছে, তাদের কাছে আমরা এই শিখেছি যে শিল্পকলার প্রতি সহনশীল উপেক্ষাই রাজশক্তির পক্ষে সবচেয়ে সাধু আচরণ।

এই বিচ্ছিন্নতার প্রতিষেধক রূপে কোনো-কোনো লেখক কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে বা ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছেন। এই উপায়ে তাঁরা হয়তো ব্যক্তিগতভাবে সাহচর্য বা আশ্রয় পেয়েছেন, কিন্তু সাহিত্যের প্রেরণা পাননি; বরং ঐ পথে শিল্পীমনের অবনতি বা অপমৃত্যুই দেশে-বিদেশে দেখা গিয়েছে। আমি যে-সংসর্গের কথা বলছি তার নামান্তর 'ক্লাব', 'চার্চ' বা 'পার্টি' নয়; সেটা সেই ধরনের সঙ্গ ও সমর্থন, যা একই বা অনুরূপ কর্মে লিপ্ত ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা শারীরিকভাবে দূরে থেকেও পরস্পরের কাছে নিয়ত লাভ ক'রে থাকেন, এবং যা না-থাকলে প্রতিভাশালীও অক্লিষ্টকর্মা হ'তে পারেন না। একটি নূতন ভালো কবিতা লেখা হ'লে আরো কয়েকটি নতুন ভালো কবিতা রচিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যথার্থ অনুমোদন ও যথার্থ বিরুদ্ধতা, ছুটোই উপকারী, প্রথমটা অপরিহার্য। বাংলাদেশে কোনোটাই নেই; কিংবা যদি বা থাকে তা এতই ক্ষীণাঙ্গ যে চারদিকের নির্বোধ প্লাবনে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সৎলেখককে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হ'য়ে টিঁকে থাকতে হয়—অবস্থাটা যেন নিজেকে নিজে আহার ক'রে বেঁচে থাকার মতো। এর মধ্যেও ভালো কাজ হ'তে পারে না তা নয়, কিন্তু সারা দেশের মনের উদ্যমে জোয়ার আসতে পারে না। আমাদের প্রাঙ্গণে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি দীপ জ্বলছে, সাহসী দীপ, হয়তো উজ্জ্বল, হয়তো সাধু ও পরিশ্রমী, কিন্তু দীপান্বিতা এখনো দূরপরাহত। তার উপর যদি রাষ্ট্রিক কারণে বাঙালির ভাষা, ভাবনা ও জীবনধারায় কোনো সংকোচন ঘটে, সেটা হবে—শুধু বাংলার পক্ষে মর্মান্তিক নয়, আধুনিক ভারতীয় চিত্তের শক্তিশেল।

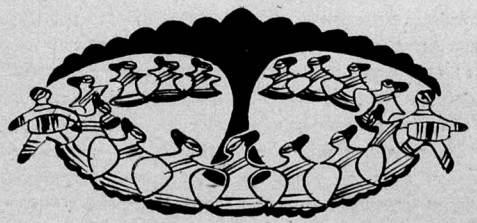

কলকাতার প্রাচীনতম আর্মেনিয়ান লিপি (১৬৩০)

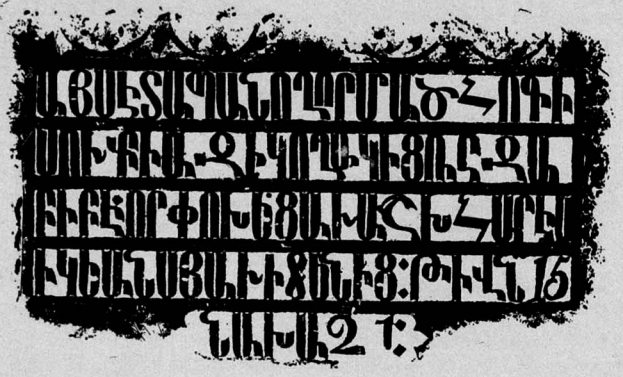

শিল্পীশহর কলকাতা বিনয় ঘোষ

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত একটি নগণ্য গ্রাম ছিল 'ডিহি কলিকাতা'। উত্তর-দক্ষিণ-পুবে আরও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ছিল 'পরগণা কলিকাতা'। উত্তরাংশের কয়েকটি গ্রাম ছিল নদীয়ার (কৃষ্ণনগর) রাজাদের অধীনে। দক্ষিণে বেহালা-বড়িশা পর্যন্ত ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারীর মধ্যে। সাধারণ বাংলার গ্রামের মতন ছিল ডিহি কলিকাতা। রাজস্বাদি আদায়ের কেন্দ্রীয় গ্রাম বলে 'ডিহি' বলা হ'ত। তার সীমানাও ছিল তখন খুব সঙ্কীর্ণ। উত্তরে বর্তমান হ্যারিসন রোড, দক্ষিণে ধর্মতলা ষ্ট্রীট, গঙ্গার তীর পর্যন্ত—এই ছিল তার আনুমানিক সীমানা। এই সীমানা ক্রমে উত্তর-দক্ষিণ-পুবে বিস্তৃত হয়ে বিশাল মহানগরের রূপধারণ করেছে, মাত্র দু'শ বছরে। 'ডিহি কলিকাতা' হয়েছে মহানগরী।

কলিকাতা শহরের বয়স দু-শ বছরের বেশী বলা সমীচীন নয়। একথা ঠিক যে ১৬৯০ সালে জব চার্নক যদি সুতানুটিতে তৃতীয়বার 'হল্ট' ক'রে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত না করতেন, যদি নবাবের অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে দুর্গ-প্রতিষ্ঠা না করা হ'ত, তাহলে গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হত না, এবং তা না হ'লে বর্তমান মহানগরের আকার ও মর্যাদা লাভ করাও তার পক্ষে সম্ভব হত না। সেইজন্যই ঐতিহাসিকরা ১৬৯০ সালটিকে কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা-বৎসর বলেন। কিন্তু জব চার্নক কলকাতার প্রথম বিদেশী বণিক ন'ন, তাঁর স্বজাতি ইংরেজরাও নন। বাণিজ্যস্থান হিসেবে সুতানুটি-কলকাতা নির্বাচনের কৃতিত্বও সবটুকু তাঁদের প্রাপ্য নয়। তার অনেক আগে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মনে হয়, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের হুগলী-সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, বাঙালী শেঠ-বসাক তন্তুবণিক ও অন্যান্য বণিকরা, পূর্বতীরস্থ সুতানুটি অঞ্চলে এসে বাণিজ্যকেন্দ্র গ'ড়ে তোলেন। বিদেশী বণিকদের মধ্যেও, ইংরেজদের অনেক আগে, আর্মেনিয়ানরা আসেন। এতদিন আমরা জানতাম, সেণ্ট জন গির্জার সীমানার

মধ্যে চার্ণকের সমাধিমন্দিরটিই কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সমাধি। কয়েকবছর আগে, কলকাতার আর্মেনিয়ান নাজারেথ গির্জার প্রাঙ্গনে, রেজাবীবে নামে জনৈকা আর্মেনিয়ান মহিলার একটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাধির গায়ে যে লিপিটি আছে, তার আর্মেনিয়ান সন ১৫, ইংরেজী সন হবে ১৬৩০ (১৬১৫+১৫)। রেজাবীবে ছিলেন দানবীর সুকিয়ার পত্নী। আর্মেনিয়ান সুকিয়াদের নামেই কলকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীট। চার্ণকের আগমনের অর্ধশতাব্দীরও আগে আর্মেনিয়ান বণিকরা যে কলকাতা অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদেশী ও বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য-কেন্দ্র হাট-বাজার-বন্দর থেকে, সুতানুটি-কলকাতা ইংরেজ বণিকদের প্রধান বাণিজ্যস্থান ও রাজধানী হয়ে, মহানগরে পরিণত হয়েছে। এই হিসেবে, কলকাতার নাগরিক রূপায়ণের কাল আরও একশ-দেড়শ বছর বিস্তৃত ক'রে, তিনশ থেকে সাড়ে-তিনশ বছর হয়।

কিন্তু ১৭৫৬ সালেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেছিলেন এবং কলকাতার নাম দিয়েছিলেন 'আলিনগর'। তার একবছর পরে, ১৭৫৭ সালে, পলাশীর রণাঙ্গনে জয়ী হয়ে ইংরেজরা এদেশের রাজসিংহাসন দখল করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক দু'শ বছরই হ'ল কলকাতার প্রকৃত ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরেজ ও ইয়োরোপীয় বণিকরা অনেকে বাংলাদেশের কলকাতা শহরে আসতে আরম্ভ করেন। সামান্য বেতনের রাইটার ও কর্মচারী হয়ে এসে, ইণ্টারলোপিং ও অন্যান্য উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন ক'রে, 'নবাবের' মতন তাঁরা স্বদেশে ফিরে যেতেন। ইংলণ্ডেও তাঁরা 'নবাব' ব'লে পরিচিত ছিলেন। প্রথম যুগের এই ইংরেজ নবাবরা এদেশী বাঙালী নবাব ও রাজা মহারাজাদের বিলাসী জীবনযাত্রা অনুকরণ ক'রে চলতেন। বাড়ীতে তাঁদের চার-পাঁচ ডজন ক'রে চাকর-বাকর থাকত। হুঁকো-গড়গড়ায় তাঁরা তামাক খেতেন, ঘোড়ায় চড়ে বা ফীটন-বগি-পাল্কি গাড়ীতে ক'রে ঘুরে বেড়াতেন, এদেশী তুক-তাকে বিশ্বাস করতেন, দেবালয়ে পুজো দিতেন, উৎসব-পার্বণে ভোজসভায় বাইজীনাচ দেখতে যেতেন, কৃষ্ণাঙ্গিনীদের নিয়ে সুসজ্জিত বজ্‌রায় ক'রে নৌকাবিহার করতেও আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। উৎসবের সময় বাজী পোড়ান হত, নানারকমের তামাসা দেখান হত, যেমন ঘোড়ার খেলা, বেলুন ওড়ান ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে বড় বড় সাহেবরা সামান্য কারণে ডুয়েল লড়তেন এবং তাতে প্রাণও দিতেন। সামান্য চুরির অপরাধে তখন কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়, ঢেঁড়া পিটিয়ে লোক জড় ক'রে, অপরাধীকে ফাঁসী দেওয়া হত। এই ছিল ন্যায়বিচার। এদেশে তান্ত্রিক দেবদেবীর স্থানে নরবলি দেবার প্রথা তখনও লুপ্ত হয়নি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের, অনেক সময়, ইংরেজরা দেবস্থানে নিয়ে গিয়ে নরবলিও দিতেন। একসঙ্গে দুই কাজই হ'ত, পুজো দেওয়া হত, দণ্ডও দেওয়া হত।

ইংরেজরা যখন এদেশে এইরকম অর্ধবর্বর জীবন যাপন করতেন, তখন জ্ঞানবিদ্যা বা শিল্পকলা চর্চার দিকে তাঁদের কোন নজর ছিল না। এইসব ইংরেজ রাইটার-ফ্যাক্টর, বণিক-সৈনিকদের মধ্যে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বিশেষ কেউ এদেশে আসতেনও না। বাজীকর ও সার্কাসওয়ালা ইংরেজরা আসতেন, পয়সা রোজগার করবার জন্য। শৌখিন কারিগরদের মধ্যে 'হেয়ার-ড্রেসারদের' মতন কেউ কেউ আসতেন এবং তাঁরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এদেশী লোকদেরও হেয়ার-ড্রেসিং শিক্ষা দিতেন। কাপড় ধোলাই করার জন্য ইংরেজ রজকরাও আসতেন। আর আসতেন কফিহাউস ও ট্যাভার্ন-কিপাররা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ও স্তরের প্রতিনিধিরা সকলেই কলকাতায় আসেন একে-একে। প্রথমে সমাজের তলার দিকের প্রতিনিধিরাই আসেন, উপরের মনীষী, জ্ঞানীগুণী, বিদ্যোৎসাহী ও কলানুরাগীরা আসেন অনেক পরে। পলাশীর যুদ্ধের পর, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে তাঁরা আসতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডের ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পীরাও দুই একজন ক'রে আসেন কলকাতা শহরে। তাঁদের আগমনের পর, কলকাতা শহর ধীরে ধীরে আধুনিক সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার আমদানিও এই সময় থেকে হতে'

থাকে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরা আসেন, শিক্ষাবিদরা আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে দু'চারজন ক'রে চিত্রশিল্পী ও খোদাই-শিল্পীরাও আসেন। জ্ঞানবিজ্ঞার তীর্থ কলকাতা এই সব শিল্পীদের আনাগোনায় শিল্পীতীর্থে পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সব চিত্রশিল্পী কলকাতা শহরে আসেন, তাঁদের কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কেউ রচনা করেননি। জরাজীর্ণ প্রাচীন পত্রিকার পৃষ্ঠার মধ্যেই তাঁদের সেই ইতিবৃত্ত সমাদিষ্ট হয়ে আছে। তাকে পুনরুদ্ধার ক'রে কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে, কলকাতার শিল্পীকথা রচনা করা খুবই কঠিন। তবু আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব সেই প্রায়লুপ্ত ইতিবৃত্ত পুনরুদ্ধার করতে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, ইয়োরোপের যে-সব চিত্রশিল্পী ও অন্যান্য শিল্পী কলকাতা শহরে এসেছিলেন, তাঁরা কি করেছিলেন, কি এঁকেছিলেন, কিভাবে এদেশে তাঁদের চিত্রকলা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার ভাব ও ভঙ্গিমা প্রচার করেছিলেন, প্রধানতঃ তাই হ'ল আমাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা স্বভাবতঃই ইতিবৃত্তপ্রধান হবে। কিন্তু তা হ'লেও, এদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকরা এই ইতিবৃত্তের ভিতর থেকে এদেশী চিত্রকলার নতুন পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে অনেক চিন্তনীয় উপাদানের সন্ধান পাবেন। পাশ্চাত্ত্য চিত্রশিল্পীদের সংস্পর্শে এসে, পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার ভাবধারা ও ভঙ্গিমার প্রভাবে, কিভাবে এদেশের শিল্পীরা শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন ক'রে যাত্রাশুরু করেন, তারও সুস্পষ্ট আভাষ এই কাহিনীর ভিতর থেকে পাওয়া যাবে। সংস্কৃতিক্ষেত্রের আরও অন্যান্য বিষয়ের মতন, শিল্পকলারও আদানপ্রদানের প্রধান তীর্থ ছিল কলকাতা শহর। কাহিনীও তাই কলকাতা-কেন্দ্রিক।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় 'রিনেস্যান্সের' প্রভাবে চিত্রকলারও নবজাগরণ হয়েছিল। সেই সময় বোত্তিচেল্লি (১৪৪৪-১৫১০), লেওনার্দো (১৪৫২-১৫১৯) মিকেলঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), গ্রুণওয়াল্ড (১৪৭৫-১৫২৮) টিশিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬), র‍্যাফেল (১৪৮৩-১৫২০) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদের আবির্ভাব হয়েছিল ইয়োরোপে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০), রেমব্রাণ্ট (১৬০৬-১৬৬৯), ভ্যান ডাইক (১৫৯৯-১৬৪১) প্রভৃতি নতুন কলাকীর্তির পরিচয় দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪), রেনল্ড্স (১৭২৩-১৭৯২), গেইন্সবরো (১৭২৭-১৭৮৮), গয়া (১৭৪৬-১৮২৬), ডেভিড (১৭৪৮-১৮২৫), ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭), টার্ণার (১৭৭৫-১৮৫১), কনস্টেবল (১৭৭৭-১৮৩৭) প্রভৃতি শিল্পীরা চিত্রকলার উৎকর্ষসাধনে ব্রতী হন। কেবল চিত্রকরদের নামের তালিকা হলেও, এই নামের ভিতর থেকেই পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে কলকাতা শহরে যেসব শিল্পী আসতে আরম্ভ করেন, তাঁদের কাহিনী পড়বার আগে এই পরিবেশটির কথা মনে রাখা দরকার। চিত্রকলার দিক থেকে কেবল এইটুকু বলা যেতে পারে যে 'পোর্ট্রেট' বা প্রতিকৃতি ও 'ল্যাণ্ডস্কেপ' বা প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রণে পাশ্চাত্ত্য শিল্পীরা তখন বিশেষ উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছেন। কলকাতা শহরে কেবল ইয়োরোপের চিত্রশিল্পীরা যে এসেছিলেন তা নয়, বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা চিত্রেরও আমদানি হয়েছিল। চিত্রশিল্পী ও চিত্র, দু'য়ের আগমনে কলকাতা শহরের চিত্রকলার ইতিহাসে ধীরে ধীরে নবযুগের সূচনা হয়েছিল।

কলকাতা শহরে বিদেশী চিত্রশিল্পীদের আনাগোনার এই কাহিনীর উপকরণের উৎস হল প্রাচীন পত্রিকার 'নোটিশ' বা বিজ্ঞপ্তি। শিল্পীরা আসতেন, এবং তখনকার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছেপে তাঁদের আগমনবার্তা শহরের 'ভদ্রলোক' ও 'ভদ্রমহিলাদের' কাছে ঘোষণা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের এরকম দু'একটি বিজ্ঞপ্তির নমুনা উদ্ধৃত করছি। ১৭৮৪ সালের ৪ মার্চের 'ক্যালকাটা' গেজেট' পত্রিকায়, 'To the Lovers of Arts in India' শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটি এই :

> Captain Francis Swain Ward, of the Madras Establishment, whose paintings and drawings of Genton Architecture, etc. are well known, and esteemed in Europe and India, having been solicited by many of his well-wishers to publish his works, which are of too extensive a nature for him to effect without support, makes known, by the channel of this paper, his intention of publishing by subscription twelve views of curious buildings, etc. all taken on the spot by himself. They are proposed to be on a large scale, and will be engraved by the first masters in England.
>
> The price will be twentyfive pagodas, or one hundred Rupees. for each set. Subscriptions will be received by Mr. J. M'Clary, or at the shop of Messrs. Williams and Rankin, in Calcutta.

ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড 'জেন্টু' বা হিন্দু-স্থাপত্যের চিত্রাঙ্কণে দক্ষ শিল্পী এবং তাঁর দক্ষতার কথা ইয়োরোপ ও ভারতের গুণী মহলে সুবিদিত। তাঁর গুণগ্রাহীদের একান্ত ইচ্ছা যে তিনি একটি চিত্রসংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু এই ধরনের চিত্রসংকলন প্রকাশ করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার ব'লে, তিনি অগ্রিম সাব্‌স্ক্রিপশন তুলে সংকলনটি প্রকাশ করতে চান। ইংলণ্ডের মাস্টার-এনগ্রেভাররা তাঁর চিত্রগুলি খোদাই করবেন ব'লে তিনি জানিয়েছেন এবং প্রতি সেটের একশ টাকা মূল্যও ঘোষণা করেছেন। মেসার্স উইলিয়াম্স অ্যাণ্ড র‍্যানকিনের দোকানে অগ্রিম দক্ষিণা গ্রহণ করা হবে ব'লে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেন ওয়ার্ডের আঁকা অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ওল্ড কোর্ট হাউসের' একটি চিত্র এখানে প্রকাশ করা হ'ল। ১৭৯২ সালে এই পুরাতন আদালত-গৃহটি ভেঙে ফেলা হয়।

১৭৮৪ সালের ৯ ডিসেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেটে' জনৈক মিস্টার কুয়েইরস এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন :

> Mr. Queiros having purchased a large and valuable collection of pictures, amongst which are undoubted originals, by the most able masters, proposes to dispose of them by Raffle, and begs leave to submit the following scheme to his Friends and the Public—

সাহেব কতকগুলি ছবি কিনেছেন, তার মধ্যে ইয়োরোপীয় মাস্টার-শিল্পীদের 'অরিজিন্যাল' ছবিও অনেক আছে। ছবিগুলি বিক্রী করার কৌশলটিও তাঁর অভিনব। লটারী করে তিনি বিক্রী করতে চান। যে স্কীমটি তিনি উক্ত গেজেটে প্রকাশ করেন, তাতে দেখা যায় শেয়ার প্রতি ২০০ সিক্কা টাকা ক'রে, ৭৫টি শেয়ার বিক্রী ক'রে তিনি ১৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে চান। ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পীদের ছবি কিভাবে কলকাতা শহরে আসত ও বিক্রী হ'ত, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

এছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বড় বড় সাহেবদের

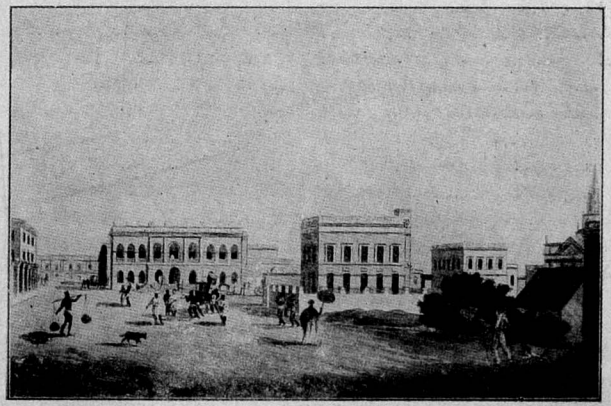

ক্যাপ্টেন ওয়ার্ড অঙ্কিত অষ্টাদশ শতাব্দীর ওল্ডকোর্ট হাউসের চিত্র

তেরোশ' তেষট্টি ॥

জিনিসপত্তর নিলামে বিক্রী হ'ত। তার মধ্যে ছবিও থাকত যথেষ্ট। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিজের জিনিসপত্তর বিক্রীর একটি বিজ্ঞপ্তি, ১৭৮৫ সালের ৩ মার্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় 'Paintings and Prints'-ও আছে। বিজ্ঞপ্তিটি এই :

To be sold by Public Auction,
by Mr. Bondfield

On Monday, the 7th of March, and the following days, until the whole is disposed of, at the Old Court House. The valuable effects of Warren Hastings, Esquire, consisting of Plate, Furniture, Paintings and Prints; a large organ, rich Sadlery, embroidered Howdah for an elephant; several rich fly Palanquins...

নগদ সিক্কা টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে হবে বলে নিলামকার বণ্ডফিল্ড বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। হাতির জমকালো হাওদা, অশ্বের রূপসজ্জা, বড় অর্গ্যান, দামি প্লেট ফার্নিচার, বহুরকমের কারুকার্যশোভিত পাল্‌কি, ছবি ও প্রিণ্ট ইত্যাদি নগদ মূল্য দিয়ে কলকাতা শহরে কারা কিনতেন? শীল লাহা মল্লিকরা কিনতেন, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ, পাথুরিয়াঘাটার সুখময় রায় প্রভৃতি বাঙালী রাজা-মহারাজারা কিনতেন, ঠাকুর পরিবারের কর্তারা কিনতেন এবং অক্রুর দত্ত, হিদারাম ব্যানার্জি, বারাণসী ঘোষ প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের প্রতিপত্তিশালী ধনিক বাঙালী বেনিয়ানরা কিনতেন। তাঁদেরই গৃহ থেকে বাইরের সমাজে এই সব জিনিসের শিল্পরূপের প্রভাব বিকীর্ণ হত।

ছবি বা ছবির বই বিক্রীর বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও, শিল্পীরা নিজেরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন। আজকালকার মতন সংবাদপত্রের মারফৎ নাম জাহির করার বিচিত্র সব কলাকৌশল তখন জানা ছিল না। সুতরাং ছোটবড় সর্বস্তরের শিল্পী, যাঁরা কলকাতা শহরে আসতেন, তাঁদের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বক্তব্য জানাতে হ'ত। আগেই বলেছি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রতিকৃতি চিত্রণ, এনগ্রেভিং ইত্যাদির বিশেষ বিকাশ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইয়োরোপীয় শিল্পী যাঁরা কলকাতায় আসতেন তাঁরা পোর্ট্রেট আঁকতেন খুব বেশী এবং সাধারণতঃ তাই করেই জীবিকা অর্জন করতেন। কলকাতার ইংরেজ রাজপুরুষরা, ধনিক বাঙালী রাজামহারাজা বেনিয়ান বণিকরা, তাঁদের ডেকে পোর্ট্রেট আঁকাতেন, অথবা তাঁদের ষ্টুডিওতে গিয়েও এইজন্য হাজরে দিতেন। এছাড়া, শিল্পীরা দক্ষিণা নিয়ে ছবি আঁকা শিক্ষাও দিতেন। সেইজন্য তাঁদের বাধ্য হয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হ'ত। যেমন, ১৭৮৫ সালের সালের ২১ এপ্রিল জনৈক মিস্টার হোন 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন

Mr. Hone presents his compliments to the Ladies and Gentlemen of this Settlement, and proposes to lay apart three days in the week for the purpose of teaching Drawing or Painting. Those Ladies or Gentlemen who wish to be taught that polite Art by Mr. Hone, may know his terms by sending a *chit*, or waiting on him at his house in the Rada Bazar.

রাধাবাজারের মিস্টার হোনের মতন আরও অনেক শিল্পী কলকাতা শহরে এসে, স্থানীয় 'ভদ্রলোক ও মহিলাদের' কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের অনেকের নাম সেকালের কলকাতার রাজকীয় জীবন-যাত্রার হল্লার মধ্যে হারিয়ে গেছে। তখনকার কলকাতার সমাজের ইংরেজ ও বাঙালী প্রধানদের প্রত্যক্ষ পোষ-কতায় তাঁরা জীবনধারণ করেছেন। আজকের উন্নত দৃষ্টিতে দেখলে, তাঁদের কলাচর্চার মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় হয়ত বিশেষ পাওয়া যাবে না। তখনকার মানদণ্ড দিয়ে তাঁদের বিচার করতে হবে। তা করলে, রাধাবাজার বা জানবাজারবাসী এই সব ইয়োরোপীয় শিল্পীদের কাজকর্ম খুব নগণ্য বলে মনে হবে না। ড্যানিয়েল, জোফানি, ডয়িলি, বেইলি, হজেস, ইমহফ, বেল্‌নস, সলভিন্‌স প্রমুখ শিল্পীরা তাঁদের কলাকীর্তির নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। তাঁদের আঁকা তদানীন্তন কলকাতা শহরের নানাবিষয়ের চিত্র, বাংলাদেশের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-পার্বণের ছবি, কেবল চিত্রকলার নমুনা হিসেবে নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবেও মূল্যবান। এদেশের শিল্পকলার নতুন অগ্রগতির ইতিহাসে তার কিছুটা প্রভাব আছে ব'লে আমরা মনে করি। প্রাচীন কলকাতার ও বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির নানাদিকের চিত্রও এই শিল্পী কাহিনীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। (ক্রমশঃ)

বাংলাদেশের বেনে পুতুল।

পুতুল ও পট

অশোক মিত্র

পুতুল সম্বন্ধে আজকাল প্রায় সকলেই উৎসাহী। প্রত্যেক বাড়িতেই এক আধটা পুতুল নজরে পড়ে এমন জায়গায় সাজানো থাকে। কোন্ মেলা বা দোকান থেকে কবে কিনেছেন তাও কর্তা বা কর্ত্রীর মনে থাকে। সাধা-রণত বয়স্করাই দেশী পুতুল কিনে ঘর সাজান। ছোট ছেলেমেয়েরা, যাদের জন্য পুতুলের সৃষ্টি, তারা 'মেকানো' বা প্লাষ্টিকের পুতুল নিয়েই খেলা করে। আদতে এই সব দেশী পুতুল এখন আর খেলার পুতুল নয়, মহৎ শিল্পকলা।

আমাদের দেশে এই মনোভাব এসেছে প্রায় গত ত্রিশ বছর। ইওরোপের মহা-মহা শিল্পীরা ইওরোপীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের দুহাজার বছরের বিস্ময়কর একটানা পরিণতি ও প্রৌঢ়ত্বে ক্লান্ত হয়ে নতুন পথ খোঁজার তাগিদ বোধ করেন। ইতিমধ্যে ইওরোপে প্রতিচ্ছবিমূলক বা ভেরি-সিমিলিটিউড-নির্ভর শিল্পের চূড়ান্ত হয়ে গেছে, চোখে যেমনটি দেখছি, ছবিতে বা পাথরে ঠিক তেমনটি কি ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তারও চরম যখন হয়, তখন ক্যামেরার আবিষ্কার এ ধরনের কাজকে প্রায় মূল্যহীন করে তোলে। শিল্পীরা বুঝলেন যে ভেরিসিমিলিটিউডের মূল্য নেই, যদি কিছু থাকে রিপ্রেজেণ্টেসনের। কিন্তু তাতেও মন উঠল না। হঠাৎ তাঁরা বুঝলেন, এহো বাহ্য,

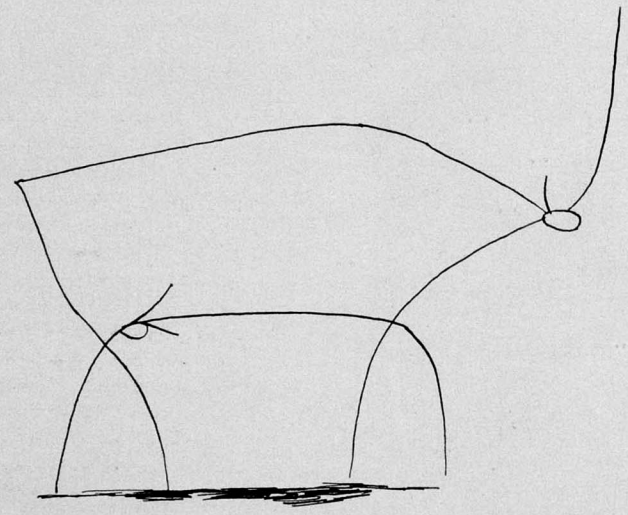

পিকাশো অঙ্কিত একটি ছবি।

এসব বৃথা নকল, কারিগরি। এতদিন তাঁরা ব্যাকুল ছিলেন, কি করে বস্তুকে ঠিক একেবারে বস্তুটির মত, তার মত করে দেখানো যায়; এখন উল্টোরথে তাঁরা ব্যাকুল হলেন কি করে এমন ছবি আঁকা যায় যার বস্তুর সঙ্গে যত সম্ভব কম সম্বন্ধ থাকবে। উনিশ শতক পর্যন্ত একটানা লক্ষ্য ছিল প্রকৃতি এবং বস্তু নির্ভরতা, তারপর শিল্পীরা হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে লক্ষ্য নিলেন বস্তুনিরপেক্ষতা; অর্থাৎ ছবি বা বা ভাস্কর্যের উদ্দেশ্য হল বস্তুকে যথাসম্ভব অতিক্রম করে, ভেঙ্গে, অথবা বর্জন করে কতকগুলি শুদ্ধ বর্ণ ও আকৃতির মধ্যে দিয়ে নিজের বক্তব্য বলা। ঠিক এই সময়ে আফ্রিকার নিগ্রো ভাস্কর্য এবং নানা দেশের অপ্রাকৃত চিত্রের প্রতি তাঁদের নজর পড়ে। পৃথিবীময় তাঁরা অধীর

তেরোশ' তেষট্টি ॥

হয়ে ঘুরে বেড়ান নতুন নতুন রূপের খোঁজে। বহু জ্ঞানে বা অভিজ্ঞতায় তাঁদের যে জরা এসেছে তা ঘোচাবার আশায় তাঁরা এমন এক শিল্পকলার খোঁজে ছুটলেন যেখানে সহজ সরল অজটিল সমাজব্যবস্থার কল্যাণে সব শিল্পসমস্যা প্রত্যক্ষ ঋজুতায়, নিতান্ত নিরাভরণ মিতব্যয়ে সমাধান করা হয়, যেখানে সরল শিশুসমাজে শিশুর নিষ্কলুষ দৃষ্টি দিয়ে সব রূপ দেখা হয় এবং প্রকাশ করা হয়।

মোটামুটি বলা যায় পিকাসো যখন থেকে বেনিনদের মূর্তি নিয়ে পড়লেন, তখন থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র দেশী পুতুল নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হল। আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লাগল, অনেকেই লোকশিল্প সংগ্রহে নতুন উৎসাহ পেলেন কিন্তু আমাদের দেশে এই অনুসন্ধানের জাত হল আলাদা। ইওরোপে বৃদ্ধ মহাজ্ঞানী শিল্পী শিশুর সরল প্রয়াসে খুঁজলেন নানা সমস্যার নিরাকরণ, তাঁর পক্ষে সেটা হল পুনরাবিষ্কারের অভিযান। কিন্তু আমাদের দেশে নতুন খোঁজ হল কিছুটা অনুকরণ; ইওরোপের আত্মসচেতন শিল্পী জানতেন লোকশিল্প নিয়ে তিনি ঠিক কি করতে চান, আমাদের দেশের শিল্পী অনেক ক্ষেত্রেই তার নিজের মন জানলেন না, পিতৃঋণ সম্বন্ধেও সব সময়ে অবহিত হলেন না, ফলে লোকশিল্প ঠিক কি কাজে লাগবে, সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারলেন না। গৃহস্বামিনী যেমন সস্তা দামের দেশী পুতুলকে গৃহসজ্জার মর্যাদা দিয়ে বিদগ্ধ সমাজে চালু করলেন, যার ফলে শিক্ষিত শিল্পীর রোজগারের পথ আরও সঙ্কুচিত হল

ভারতীয় দক্ষিণী পুতুল।

(একটা পট একটাকা, একটা ছবি একশ টাকা ; পট টাঙালে তারিফ পাওয়া যায়, ছবি টাঙালে রুচি সম্বন্ধে সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী), শিল্পীও তেমনি নিজের ঐতিহ্য খানিকটা অস্বীকার করে, নিজের ছবিতে লোকশিল্পের তৈরি সাজনকে সরাসরি আমদানি কোরে, শিল্প সমস্যা সম্বন্ধে চোখ বুজলেন।

এর সঙ্গে রাজনীতিও জুটল। উনিশ শতকের শেষে জাতীয়তাভিমানী শিক্ষিত সমাজের হাবেভাবে ভয় পেয়ে বিদেশী প্রভুরা তাড়াতাড়ি আর্টস্কুল, ওরিণ্টোল আর্ট

নাইজিরিয়ার নিগ্রোদের কাঠ খোদাই।

আকাঙ্ক্ষা আঁকড়ে থাকি। তার জন্য তাঁরা আমাদের লোকশিল্পকে মাথায় তুলতে অতি অবশ্যই প্রস্তুত, ঠিক যেমন তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে অপটু ওরিয়েণ্টাল আর্টকে মাথায় তুলে নাচতে।

* * *

পাঁচশ দেশের পাঁচশ পুতুল জড়ো করে এক জায়গায় সাজালেও, পাঁচশ জায়গার সাধারণ লোক এসে যে যার নিজের দেশের পুতুলটি প্রায় চিনে নিতে পারবে পুতুলের এমনই মজা। অথচ 'শিক্ষিত' লোকের হয়ত ভুল হবে, তাঁর চোখে পড়বে মিলটুকু, অমিলটুকু বা স্বকীয় বৈশিষ্টটুকু তত তয়। যদি একই ধরনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা দুটি জাতের

উপরেরটি—রাজস্থানি পুতুল।
তলারটি—কাঠের তৈরী কোণ্ডা পিল্লাই (দক্ষিণ ভারত) পুতুল।

কেন্দ্র ইত্যাদি খুললেন এই আশায় যে অন্তত একটি দলও বিপ্লব ও হিংসার পথ ছেড়ে, সুকুমার, পেলব, রূপহীন নতুন শিল্প আন্দোলনে মেতে থাকবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, চোখ বন্ধ করে থাকবে। তেমনি যখন আজ সারা দেশ নানা ভাবে জেগে উঠেছে, অধীর অসন্তোষে সারা দেশবাসী যখন চায় যেমন করে হোক লাফিয়ে, ছুটে, উপোস করে, অন্য দেশের নাগাল পেতে, তখন অনেক বিদেশী বন্ধু চাইবেন যাতে আমরা লোকশিল্প, লোকচিত্র ইত্যাদির গৌরবে মত্ত হয়ে থাকি, যাতে আমাদের শিল্পব্যবস্থা গ্রামীন অপটুত্বেই আবদ্ধ থাকে ; যাতে আধুনিক স্পৃহা বর্জন করে আমরা গ্রামীন আশা

মধ্যে থাকে, তা সে-দুটি জাত যত হাজার মাইল বা যত হাজার বছর ব্যবধানেই থাকুকনা কেন, তবে তাদের লোকশিল্পের মধ্যে কতকগুলি মোটা মোটা মিল থাকবেই। মিল থাকবে জ্যামিতিক বা প্রাকৃত রূপের ব্যবহারে, সাজনে, উপকরণের মিতব্যয়ে, প্রতীকের প্রয়োগে, ইঙ্গিতের যোজনায়। কিন্তু সেই সঙ্গে অমিল থাকবে প্রাকৃতিক পরিবেশের অমিলে, দুটি জাতির জীবনযাত্রার ছন্দের পার্থক্যে। মিলও যেমন স্পষ্ট, অমিলও তেমনি স্পষ্ট। গণ্ডদের কাঠখোদাই বা পুতুল কখনই নাগাদের পুতুলের মত হবে না, তাদের রঙ, সাজন, ব্যবহার সবই আলাদা। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার পুতুল আর মেদিনীপুরের নাড়াজোলের পুতুল তফাত ; মাত্র পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানে থেকেও দুটি

নিগ্রো কাঠ খোদাইয়ের আর একটি নমুনা।

সংস্কৃতির তফাত। অথচ পাঁচমুড়ার পুতুলের সঙ্গে মৈমনসিংহের মধুপুরের পুতুলের মিল আছে ; মিল আছে নাড়াজোলের পুতুলের রঙ, গড়ন ও সাজনের সঙ্গে যশোরের এবং রাজাপুর বারুইপুরের পুতুলের। কিন্তু যশোরের সাধারণ লোক নাড়াজোলের পুতুল দেখেই বলে দেবে এটা তার দেশের নয়।

এইখানেই আধুনিক আত্মসচেতন শিল্পীর কাছে দেশী পট বা পুতুলের বিশেষ মূল্য। একটি ছোট কাগজে, কাঠের খণ্ডে বা মাটির তালে কোথায় কেমন ভাবে সেই একান্ত স্থানীয় দেশজ রূপটি লুকিয়ে আছে : যা স্পষ্ট নয়

বুনিনদের তৈরি মূর্তি।

অথচ পূর্ণপ্রকাশিত ; ব্যক্ত নয় অথচ ব্যাপ্তচরাচর ; যা দেখলেই লোকে বলে দিতে পারে সেটি ঐদেশের ঐ গ্রামের ঐযুগের, যদিও তার রূপ নিতান্তই জ্যামিতিক, সার্বভৌম, রঙ ও সাজন কঠোর, নিরাভরণ, অনাড়ম্বর, অসীম মিতব্যয়ে সংক্ষিপ্ত ! কোথায় লুকিয়ে থাকে সেই স্বাক্ষর যার জন্য আজ প্রত্যেক আধুনিক শিল্পী ব্যাকুল ? আজ নানা কারণে সর্বদেশের সর্বকালের চিত্রলক্ষণ একাকার, যে-কোন শিল্পীর সহজলভ্য ; আজকের দিনে শিল্পীর একান্ত সমস্যা হল কি করে সর্বদেশের, সর্বকালের ছবি দেখেও, সব অভিজ্ঞতাকে পরিপাক করেও, এমন এক ছবি তিনি আঁকবেন যাতে মুহূর্তে প্রতিভাত হবে তাঁর নিজের দেশ, নিজের সমাজ, নিজের কাল, নিজের দৃষ্টি ; কারণ, সার্বভৌমতা আসে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে ; তিলোত্তমা অন্যভাবে হয় না। সুতরাং দেশী পুতুল যেমন সেই সমাজের বিশিষ্ট রূপ ও জীবন থেকে উদ্ভূত এবং সেই হেতু সেই দেশের জলমাটি হাওয়ার সঙ্গে একেবারে একাত্ম, আধুনিক শিল্পীর অন্বিষ্টও অনুরূপ কিন্তু ভিন্ন। তার অন্বিষ্ট হল কি করে সারা পৃথিবীর চিত্র অভিজ্ঞতা পরিপাক করেও এমন সৃষ্টি করা যায় যাতে সামান্য এক টুকরো চটে দেশ, কাল, পাত্র, সংস্কৃতি, বিশিষ্ট মন প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পুতুলের সুবিধা এই যে সে প্রায় স্বয়ম্ভু, অচেতন, যুগযুগান্তরের স্থানীয় গ্রামব্যবস্থার সঙ্গে আছে তার নাড়ীর যোগ : আধুনিক শিল্পীর দুর্বিপাক এই যে তিনি সচেতন, সারা পৃথিবীর সৃষ্টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে, তাঁর পক্ষে গ্রাম্য নিশ্চিন্ততা আঁকড়ে থাকা একান্ত অসম্ভব, নাড়ীর সহজসূত্রে তাঁর বেঁচে

ভারতীয় চিত্রিত একটি রঙিন পুতুলের নিদর্শন।

থ্রোয়িং সিষ্টেম্-এ তৈরী বাঁকুড়ার বিখ্যাত পোড়া মাটির ঘোড়া।

থাকা আর সম্ভব নয়। পুতুলগড়া বা পট আঁকার ব্যাপারে গ্রাম্য কারিগরের কাছে তার ব্যক্তিগত শিল্পসমস্যা কম : সমাজ, জলবায়ু, মাটিই তার রক্তের মধ্যে দিয়ে তার ছুরিতে, তুলিতে, হাতে সে সমস্যার নিরাকরণ করে, তাকে সজ্ঞানে করতে হয় না। কিন্তু আধুনিক শিল্পীর সমস্যা দ্বিমুখী, ঐতিহ্যগত ও ব্যক্তিগত। একদিকে সমস্যা হল সবদেশের, সবকালের শিল্প-সৃষ্টিকে কি ভাবে নিজের মত করে বিশ্লেষণ করে, কেটে, চিরে, ভাঙতে হবে ; অন্যদিকে নিজের দেশজ ঐতিহ্যকে কি করে' আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে হবে, এবং ঠিক কোনখানে, কি ভাবে এক অদ্বিতীয় স্বকীয় রীতিতে দুই ধারার সমন্বয় করতে হবে, যার ফলে তাঁর সৃষ্টি হবে নিতান্ত দেশজ হয়েও সার্বভৌম, মুহূর্তের প্রতীক হয়েও সর্বকালগ্রাহ্য, বিশিষ্ট ভাষাভাষী হয়েও সর্বজনবোধ্য ; যার ফলে দেশী পুতুল বা পটের সঙ্গে তাঁর কাজের সেই মিল থাকবে যে মিল থাকে শিশুর সঙ্গে তার প্রৌঢ় বয়সের পরিণতির ; দেখলেই চেনা যায়, অথচ দুটির মধ্যে একটি আস্ত জগৎ ও যুগের ব্যবধান।

সম্পাদকীয় মন্তব্য :—

নিগ্রো কাঠ খোদাই এবং বুনিনদের ধাতব মূর্তি যদিও আদিম শিল্প হিসাবে বিখ্যাত তথাপি আজকালকার আধুনিক শিল্প জগতে এর প্রভাবের স্বীকৃতি সর্বজন বিদিত।

শ্রদ্ধেয় লেখক অশোক মিত্র মহাশয় তাঁর লেখা এই 'পুতুল ও পট'-এ এই নিগ্রো আদিম শিল্পের উল্লেখ করায় আমরা বিশেষভাবে এইসব মূর্তির কয়েকটি ফটোগ্রাফ্ সংগ্রহের পর শিল্পীকে দিয়ে রেখা-চিত্রে রূপান্তরিত করে প্রকাশ করলাম। সুঃ ঠাঃ

ঢোক্‌রা কামার

বাংলার জাতি তত্ত্বে উল্লিখিত অষ্ট কামারের মধ্যে এক কামার 'ঢোক্‌রা'। ইহা ব্যতীত সেকরা, চাঁদ-কামার, লৌহ-কামার ও অন্যান্য আরো কামার আছে।

কমল মজুমদার

ঢোক্‌রাদের তৈরি পিতলের লক্ষ্মী-মূর্তি।

যাঁরা হাওয়া বদলাতে সাঁওতাল পরগণা যান, কিংবা যাঁরা, যাঁদের বাড়ি লালমাটির দেশে যথা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন—যে ধান মাপার পাইগুলি অথবা কুন্‌কে পিতলের হয়, এবং হাট-বাজারে দেখা যায়। কাঠের যে হয় না, এমন কথা আমরা বলছি না ; কিন্তু পিতল নিয়েই আমাদের কথা।

এই পিতলের কুন্‌কে অথবা পাইগুলি ভারী সুন্দর দেখতে। এর আকারটা বড় সুন্দর, অনেকটা বাটির মতন, ঠিক এমনি আকারের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন কোসন আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না, তাই অনেক শৌখিন লোকের কাছে এর চেহারাটা ভারী আনন্দদায়ক। তাঁরা এগুলি খরিদ করে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং আর পাঁচ শৌখিন জিনিসের সঙ্গে খুব যত্ন করে রাখেন। বন্ধুবান্ধবরা তারিফ করেন। অনেক বিদেশীও এগুলি কিনে নিয়ে যায়।

পাই-এর ধার ঘেঁষে, বেড় ঘিরে, বহু নকশা থাকে— মাছ থাকে, জোয়ারের জল-রেখা থাকে, ট্যাঁড়া-কাটা, দাঁড়ি-কাটা অনেক জ্যামিতিক রেখা থাকে। দেখে মনে হবে—ওইটুকু ব্যাপার করতে বহু ভাবতে হয়েছে, অনেক চিন্তা এর পিছনে রয়েছে। মাছের চিহ্ন ভারী লক্ষ্মী! মাছ-চিহ্ন অনেক অনেক জায়গায় দেখা যাবে, এমন কি 'ত্রিরত্ন' প্রতীকের দু'টি দু'পাশে মাছ আমরা দেখেছি। মীন অবতার বহু ব্যাপারে রয়েছে। এখানে, সত্যি বলতে, মাছ-চিহ্ন প্রতীক হয়ে নেই। যেমন সুন্দর সুন্দর আঙ্গুলের চুটকিতে পলকাটা রুপোর মাছটি থাকে, তেমনি শুধু পলাতক-ভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীটি এখানে গোটা মাছটির মধ্যে রেখার জোর বাঁধনে দেশ বা স্পেস্ হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সেই ভঙ্গীটি আপনা থেকেই এসে যায়। সোজা ছক হ'লেও, মাছটি মনে হবে যেন কিছু বাঁকা—খুব সোহাগ করে মাছটি বসিয়ে দিয়েছে।

পাই-এ যে ধরনের কাজ, ঠিক অবিকল সেই ধাঁচের কাজ করা বহু কিছু সামগ্রী দেখা যাবে। গৃহস্থের নিত্যপূজার সাট থেকে সুরু করে রকমারি প্রয়োজনীয় জিনিস এই রীতিতে তৈরি। দেবদেবীর মূর্তি, কাজললতা, প্রদীপ ইত্যাদি।

পৌষ মাসে যখন ধান প্রায় মাঠ থেকে খামারে উঠে আসে, মাঠে মাঠে যখন গুড়ের ভাটি বসে—বোল্‌তা মৌমাছি ভারী ব্যস্ত হয়ে ঘোরা ফেরা করে, বদরাগী শব্দ উত্থিত হয়। তখন গ্রামের বার সীমানায় ভাটি জালাবে ঢোক্‌রারা—বুনোরা। এরা ছেলে-পুলেদের কাছে খুব অবাকের বিষয়। এদের কাঁধে বড় থলি, কখোনো ঝুড়ি কাঁধে বা বাঁকে। বাঁকে অনেক এটা সেটা। কখনও কখনও মনে হয় এরা ভেল্কী দেখায়, যাদু জানে।

লোকগুলো যেন রোদের দিকে চাইতে জানে না, জুজু হয়ে রয়েছে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে, হাঁকে না। গৃহস্থরা এদের চেনে, তারা বলাবলি করে "সাত সকালে ঢোক্‌রা কেনে গা?" ঢোক্‌রারা অপয়া নয় বটে, তবু লোকে ওকথা অভ্যাস মত বলে থাকে। যার দোরে দাঁড়ায়, তাদের পড়শীরা ভাবে, বরাত দেবার ছলে গৃহস্থ তৈজস পত্তর বেচ্‌ছে, যারা এ হেন কথা ভাবে তাদের দোষ দিব কি সাহসে, সময় বড় এলো হয়েছে। বয়াটে ছোক্‌রা যারা, যারা 'সাতলায়ের ভোমরা এ গাঁয় কেন হায়' গান করে—গানটা ঝুমুরে বাধা—যারা গাঁজা সবে ধরেছে, তারা বাড়ির ঘটি বাটি ছেনতাই কোরে, চুরি কোরে, ঢোক্‌রাদের কাছে বেচে দিয়ে—খেজুরগাছ তালগাছ ডাকে। তাই বটে গৃহস্থদের ভয়।

কিন্তু আবার তখুনি পরপায় বউটি পাশের বাড়ির বৌ-ঝিকে বলে—"ও সই সইলো, ঢোক্‌রা গো, হিঁ গো, কাজললতা দিবে মন করেছিলে—ইসছে গো ঢোক্‌রারা।"

বাড়ির গিন্নী—"হি মিন্‌সে পারবি, একটা লনীচোরা গড়ে দিতে।"

ঢোক্‌রারা উঠনে ক্রমে ক্রমে যায়, দেহে একটা সুস্থির পাক দিয়ে থলি নামায়। ঝুড়ি বাঁক নামায়। প্রথমেই বলে—"একটা আগা দেন্ না গো, চুটা খাব।"

এখনো এরা বুনোদের মত চুটা খায়, হুঁকোকল্কে জিনিস এদের কাছে বড় অদ্ভুত। তা দেখে কতবার এরা যে মুচ্‌কি হেসেছে তার ঠিক নেই! এদের হাসিটা যে মুচ্‌কি হাসি, তা ভিন্ন জেলার লোক বোঝে না। শালের জঙ্গলের মধ্যে হলে, তখন বোঝায় এটি মুচ্‌কি হাসি! এরা যে নিম-বুনো। এদের মধ্যে কেহ কেহ মৌজার পর মৌজা পার হয়ে, রেল বিজ্‌লী আলো দেখেছে, লরী চেপেছে। আবার জানি না, হয়তো এদের অনেকে আজও কোঁড়া খায় স্কন্ধ খায়। আগুন হয়তো এদের শীত মানিয়ে জামা হয়ে গেছে।

গেরস্থরা একটু আগা এনে দেয়, এরা ট্যাঁক থেকে একটু কালো তামাক পাতা বার করে, শালপাতায় জড়িয়ে টানতে সুরু করে, মেয়েরা খুক্ খুক্ করে কাসে, গা টেপা-টিপি করে। চুটা মৌজ করে, থলি থেকে নমুনাও দেখায়। "এই লাও লনী চোরা গো—ও ধনি দেখ্ গো মদন মোহন শ্যাম" বলে ভক্তি ভরে নমস্কার করে, যেন প্রসাদ দিচ্ছে—এমনই মনোভাবে তুলে দেয়। 'লনী চোরার' থর ছায়া সাঁৎ করে লালমাটির উপর দিয়ে ঘুরে উঠে যায়।

জীবন্ত না হলেও এ মদনমোহন বাস্তব। নবোঢ়া মেয়েটির হাতের তালু হলুদ—তার উপর ছোট্ট মদন মোহন এই সকালের রোদে কথা ক'য়ে উঠে। কি এসে যায় এর কাজের ধাঁচে, মনে হয় যেন একটাই সুতো ঘুরে ঘুরে উঠেছে, শেষ যে কোথায় হয়েছে তার ঠিক নেই। চোখ দু'টি আড় হয়ে আছে, মুখে একটি মোটাসোটা হাসি। গভীরতা আছে, প্রদীপ আলোতেও যা, দিন-মানেও তাই।

ঢোক্‌রারা নাকি কথা বলে না! চুটার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "লাও লয়ন ভরে দেখ্ গো, উজানের ভাল-বাসা ঠিক লাইনে যাবে গো ধনি।" এরা নিশ্চয়ই বাউল নয়, তবু যেন কথার পিছনে কোথায় যেন এক তারার আওয়াজ আছে বা? এই ছোট শালপাতার দোনাভরা রহস্যে মেয়েরা একটু কাছে ঘেঁষে বসে, শীত বলে নয়। ঢোক্‌রারা আবার জিজ্ঞাসা করে "পসন্দ হলো, কেমন কাজ গো, তবে যেন বড় দোষ ঘাট হয়েছে, কেনে? কেনে সোনার মানুষকে পিতলে গড়েছি? গঙ্গা শুকাবে গো, কি করি!" তারপরই কি যেন মনে পড়ল। "হায় গো রাধাসতী দেখালাম না গো। রাধা, ব্রজবুলি ঘন টান।" দুকৌটা জলের ইহকাল পরকাল। মদনমোহনের বাঁশি ধরার কায়দা যেমন অদ্ভুত,

রাধার তেমনি আঁচল ধরার কায়দাটি। হাতটি চতুরভাবে ঘুরে গেছে, আঁচল তো আর কিছু নয় সোজা সুতোর মতন। যে কোন বড় বড় রাগের পিছনে যেমন একটি সহজ ঠাট্ থাকে! যাকে কিছুতেই তেমন-কান না হলে ধরতে ছুঁতে পারে না; তেমনি এখানেও দেখতে পাই, ধরার একটা ঠাট্ মাত্র জেগে আছে। হাতের আঙুলগুলো অনেকটা ব্যাঙের আঙুলের মত, ভারী ছেলেমানুষের আঁকা মানুষের হাতের আঙুলের মত। এত সত্ত্বেও এ-দেহতরণী, আমার আপনার মতই, এতটুকু লাগলে যারা মাগো বাবাগো বলি।

গৃহস্থরা এদের দিকে খুব করে তাকায়, বুঝতে চেষ্টা করে ঢোক্‌রা মিন্‌সেগুলো কোথায় এত চতুর। গা থেকে মহুয়ার গন্ধ জেল্‌লা দিচ্ছে, খুব যে কখনও দেখাশুনো হবে এমন মুখ এদের নয়। কোথায় যেন একটা ছাড় ছাড় ভাব, আঙুলগুলো সুতকো-রোগে খাবার জড়ির মত। কোথাও ইঁদুর-ইঁদুর ভাব নেই। ঢোক্‌রা তখন বলছে, "চার ধামের পুন্নি হলো গো, মদনমোহন রাধা সতী এক ঠাঁই, শীল নোড়া বুকজুড়ে থাক্‌বে, ভেন্ন্য হলেই পাপ—গো মা……! লাও বল।"

"হিঁ গো, এগুলা তোমরা কেমন করে কর গো?"

এরা হেসে উত্তর দেবে—"আমরা লায়েক বটে, আমাদের ছানা আছে গো……তোমাদের মত……।"

ওদিকে ধান ফুটে, বাষ্প উঠে উঠে মেঘ হয়ে যায়, আর সামনে শাড়ীর মোটা মোটা ভাঁজ, রেখা আঁকাবাকা, এ হেন উক্তিতে হেলে দুলে ওঠে। এরা হাসে, মন ঠিক ঠিক বলে। এবার যখন আবার এরা 'ননীচোরা' 'মদনমোহন' 'রাধাসতীর' দিকে চায়, তখন তারা অবাক হয়ে থাকে। আড়ে বুঝে নেওয়া হ'ল যে ঢোক্‌রাদের হাতযশ আছে, তাই এই রূপগুলি আরও নিকট হয়ে উঠলো।

স্বপ্নের কথা যেমন ছাড়া ছাড়া, তবু সে কথা কত গোপনের মানুষকে আর একা থাকতে দেয় কই, গাছ পাতা, উড়ে যাওয়া খানিক রঙ সবই যেন ডাঙা ছেড়ে গেছে, কিছু নেই সামনে,—চাহনিতে! কম্পিত আধা-ভাঙা কথাগুলো, একটি অটুট দোহারা কলেবর নিয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের হাতের ছোট ছোট বস্তুগুলি, তেমনি হয়ে উঠে। গানের কলিও হয়তো ভেসে আসে, "বাজন তেরশ' তেষট্টি ॥

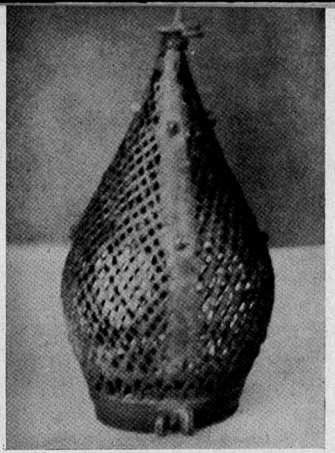

ঢোক্‌রাদের তৈরি পিতলের জালতি বট্‌য়া।

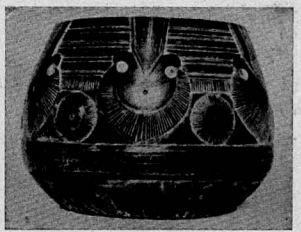

ফুলকাটা কুন্‌কে অথবা পাই।

হাতীর মূর্তিসহ পাই-এর আর এক নিদর্শন।

নূপুর" পায়। এখন আর কোন ধাঁধা রইল না, তুলসীর গন্ধও এই ঝক্‌ঝকে হাওয়ায় আসে।

এবার আবার থলি নড়ে উঠলো, হাত চালা সুরু হ'ল —এবার যা বার হয়ে এলো, তার সঙ্গে বাঙালীর জীবনের বুকজোড়া সম্বন্ধ। মেয়েরা ধন্য ধন্য করে উঠলো, আহা কি রূপ গো, সিঁথের সিন্দুর বা এটি লক্ষ্মী প্রতিমা যেন! হাতে পদ্মটি পর্যন্ত রয়েছে। পদ্মর শ্রীটি অনেকটা ঈজিপ্‌সীয় লিলি ফুলেরই মত। অনেকটা কেয়া ফুলের পাতার মত হয়ে যাওয়া। চক্‌চকে পিতলের গায়ে ঈষৎ টুনটুনি পাখীর পিঠের সবুজ আভা। সেই সবুজের ঠিক উপরে কল্যাণময়ী হাসি, এবং তারই অস্থায়ী আয়ত দুটি লোচন। ভারী আশ্চর্য রূপ তার। মা যেন বর দিতে পারেন। এ বাড়ির গিন্নী লক্ষ্মীর দিকে এক ভাবে থ হয়ে তাকিয়ে আছে, চোখের পাতা—ধান যেন বুলবুলি খেয়ে গেছে! গৈরিক রঙের ঘটের গা বেয়ে পাঁচটা আম্রপল্লব, অজন্তার রেখায় ভর করে নেবে গেছে, পান আছে, গুয়াও আছে। আর এয়োরা শুনতে বসেছে ধান দুব্বো হাতে। ব্রতশেষ হলেই, উলু দেবে এই বিধি। এই লক্ষ্মীকে দেখে গিন্নীর চোখ একটু লাল হয়, বহু দিনের এক অজর দীর্ঘশ্বাস ঠেলে দিল। এই দীর্ঘশ্বাসই আঁচড়ে-আঁচড়ে যখন দেখা দেয় তখন কত তার নাম, কখনো ইতিহাস কখনও বা কাব্য।

ঢোক্‌রা বলবে, 'ওগো পসন্দ হলতো বরাত দাও, দাম, আর কি লবো? ক পাই ধান দিও।'

এবার দর দস্তুর। এত ভাব, এত মতি, ঝড়ে এঁটো পাতার মত উড়ে গেলো। "যা তো সেই খেত্তুরে (শ্রীক্ষেত্র) বাটীটা লিয়ে আয়, যা তো সেই ঘাঁস (গ্যাস আলোর শেড অনুকরণে) বাটীটা লিয়ে আয় দেখি, কিন্তু এ সব দিয়ে গড়লে পাপ লেই ত?"

"আগা সব্ব পাপ ভাগা, আগা খাটি করবেক গো" ঢোক্‌রারা উত্তর দিবে। —"কুলাবে তো গো?"

"হি গো, লথ পরা পেঁচা, দুল পরা হাতী, সব হবে গো। লাও, এখন দাও দিকি···কিন্তু মাগো চার পাইতে পোষাবেক লা গো, ছেনাপোনা আছে, লিজের পেট আছে, আর দুমুটা দিও গো। বলি, কত মশালা লাগে করতে, জননী তা বুঝলে, বলবে লাও আর ধান লাও।

"হি যে মোম্‌টা লয়, ইটা জঙ্গলে যাই, চাক ভাঙ্গি তবে আসে গো, বনদুর্গার পুজা দি গো এক কলসী হাঁড়িয়া, লয় মহুয়ার রস, এক পাই চিঁড়া, সিন্দুর, আলতা, মুরগী। বুঝ, কত খরচ। যত খরচ তত ঘাম। শুধু তো মোম দিলেই যে হবেক তা লয়, বড় খাটালীর কাজ, তেল সিন্দুর লা (গালা) মিশাবে, পড়্‌তা আছে, তার'পর জাঁত পুঙ্গি ফেলি আয়স্তে আয়স্তে গড়বো আমরা—ঠাকুর গড়ি মিছাই বলব না গো। তোমার সামনেই করবো এখানে।"

"তাই হোক, পিতলের উপর নজর দেওয়া যাবে।"

আধ সেরই বাটির মত একটা মুচি এদের আগে ভাগেই করাছিল। মুচিটা দেখতে ঠিক মনে হয় একটা মেয়ে কিছু গড়েছে—যার খুব হাত নেই। শুধু হাতে কুমোরে গড়লেই যে ভাল হত এমন বলি না, চাকের জিনিস আর এক রকম, বড় হাঁড়ী কল্‌সীর তলা যেমন এক বনেদের তেমনি নয়, আঙুল দিয়ে তাকে মোলাম করতে হয়! জোড় খাওয়াতে হয়! মুচিটা তারা রোদে দিলে, একজনা উনুন খুঁড়তে লাগলো, অন্যজন গেল আর দু চারটা মুচি তৈরি করতে। কারণ একটা যদি বেগোড় করে, তখন আর একটি চাই।

তৈরি মোম ছিল সেটাকে গালিয়ে, জাঁতপুঙ্গিতে ঢাল্‌লে। জাঁতপুঙ্গি জিনিস নেবু নিঙ্‌ড়ানো যন্ত্রর মতন, তলায় ছোট ছোট হাজার ছেঁদা, মোম ঢেলে উপরে জাঁতাটি বসিয়ে চাপ দেয়—হাজার সুতোর মত মোম বার হয়।

বালি মাটির কাঠামোর উপর সেই সুতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঠোয়, হাত পা, বুক, চোখ নাক ঠোঁট সবই হবে। শেষে, তার উপর মাটি ছেনে পলেস্তারা দেয়, এইভাবে মোমের পুতল ঢেকে যায়, শুধু দুপাশে বা এক পাশে থাকে নালিকাটা। তারপর রোদে এগুলোকে শুকোতে দেয়।

আগুন ধরিয়ে তাদের স্বরচিত ছাগলের চামড়ার হাপর দিয়ে খুব বাতাস দিতে থাকে। মুচিতে পিতল। আগুন যখন গন গনে, পিতল গলে ক্ষীর, এরা নুনের ছিটে দেয়, সোহাগা দেয়। তারপর সেই মাটি বদ্ধ পিতলের ছাঁচটি আগুনে ধরে মোমটি গালিয়ে নালি দিয়ে বার করে নেয়। মোম বার হয়ে গেলে দু পায় চেপে ধরে পিতল ঢালে।

মূর্তিগুলো নরুন দিয়ে জট মারে, চিকণ করে। তারপর গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে গৃহস্থদের জিনিস বুঝিয়ে দেয়।

ফাতিন হামা

পিরামিড রোড

আতাউর রহমান

অদ্ভুত মেয়ে ফাতিন হামামা। মরক্কো থেকে দূর টাইগ্রীস পর্যন্ত বহুলোক ফাতিনকে জানে, তার ছবি সযত্নে রাখে, ভালবাসে। এই জনপ্রিয়তা, এই ভালবাসা তার চরিত্রের কোন ঐতিহাসিক দৃঢ়তার জন্যে নয়, অথবা অন্য কোন সদ্‌গুণের জন্যেও নয়, সে শুধু তার অবয়ব আর রূপ আছে বলে। হাজার হাজার দর্শকের ভালবাসা প্রশংসা তাকে যেন আরও রূপবতী করেছে। আমারও ফাতিনকে ভাললাগার পিছনে ছোট একটি কারণ ছিল।

অক্টোবরের এক নিঃসঙ্গ বিকেলে কায়রোর রু সুলেমান পাশা দিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরছিলাম। রাস্তায় আলো আর প্রাকৃতিক সুলভ আঁধার, এ ছাড়া নিয়ন স্বাক্ষরে দু'পাশের দেওয়াল ভরা। দেয়ালে লেখার বাতিক যেন এ-দেশটার সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে, মানুষের চোখ দুটিকে অক্ষরের দিকে ধরে রাখতে চায়, দিনে তো সম্ভব হয়েছেই—রাত্রেও এবার সম্ভব হলো নিয়নের জন্যে। দোকানের পর দোকান দেখে চলেছি। কায়রোর দোকানগুলি অদ্ভুত

মনোরম, সুন্দর করে সাজানো। বইয়ের দোকানে বহুলোকের স্মৃতিকথা ছোটবড় জানলার কাঁচের ওপাশে সাজানো, শৌখিন করে আলপনা কাটা। এই দেখছি, এমন সময় যেন কোনো এক হাতের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করলাম! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আবু শিপ।

যে মানুষটিকে দেখেছিলাম অফিসের প্রকাণ্ড মেহগনি. টেবিলের পিছনে, কাগজপত্র এপাশ-ওপাশ করছেন, তাঁকেই হঠাৎ রু সুলেমান পাশাতে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব বিস্তার করতে দেখেও যেন ধোঁয়াটে লাগলো। বহুদিনের বন্ধুত্বের সুরে শিপ বললেন—"মঁসিয়ে এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?" প্রতিবাদ জানালাম। পিছনে চলমান গাড়ির আওয়াজে সেই প্রতিবাদ আরও গভীর, নিকট হয়ে উঠল। আবু শিপ তাঁর নিরীহ মুখটি তুললেন, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ শান্ত সে মুখ এবার দেখা গেল।—"দেখ তুমি আমার ওখানে সেদিন যখন গেছিলে, তখন ভাল করে আড্ডা জমানো হয়নি। আজ চল···সময় আছে তো?"

সময়! বিদেশে সময় উপচে পড়ে। কিছুই করবার ছিল না। সুতরাং আবু শিপের সঙ্গ নেওয়া গেলো। যেতে যেতে, তিনি বললেন—"সামীরা",—বলে থামলেন।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর, শিপ হঠাৎ বললেন—"সামীরা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো।"

সামীরা! মনে পড়লো মিষ্টি চেহারার একটি মেয়েকে—যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দোভাষীর সাহায্যে। তবু অনেক কথাবার্তা হয়েছিল, অবশেষে জানি না কেন অত্যন্ত খেদ করে সে বলেছিলো,—"জাহান্নামে যাক ফ্রাঁসেজ—আর আরবী কথা ঘোড়ার ব্যাপারে বাঁধা থাক, তুমি যদি আসবে জানতাম, তাহলে ইংরেজি মক্স করতাম।"

সামীরা আরবী আর ফরাসী ছাড়া আর অন্য কোন ভাষা জানে না তার জন্যেই হয়'ত এই ঠাট্টাভরা উক্তি। অনেকটা পথ চলেছি এমন সময় কানে এলো আবু শিপের গলা,—"কি ভাবছো?"

মুখ তুলে চেয়ে দেখি আমরা রু সুলেমান পাশা ছেড়ে পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছি।

বললাম—"ভাববো আবার কি? এখন এখানে শুধু দেখছি, ভাববো দেশে গিয়ে", ব'লে ওর চোখের দিকে চাইলাম।

—"কিন্তু, অনেক কিছু আছে এই মাটিতে—যা ভাবার নয় কি?" বলে মৃদু হাসলেন।

এ কথা সামীরাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হলো বোধ হয়! আমরা এবার একটি গলিতে ঢুকেছি। কিছু পরেই একটি খিড়কি দরজার সামনে।

এ কোথায়? এ যে এক চেতন-বিলোপের মধ্যে! যেখানে বহু সুবেশী লোকজন···এযে এক বিরাট সরাই! মিশরী আর মিশরকুমারীরা অগণন, সবাই বেশবাসে শৌখিন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কথারও হিল্‌মিল উড়ছে।

একটির পর একটি টেবিলের পাশ কাটিয়ে আমরা একটি ছোট ঘরে ঢুকলাম। ঘরটি চৌবাচ্চার জলের মত চুপ এবং শান্ত! দেখেই মনে হলো 'বার'। দু'চারটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টেবিল, এছাড়া ঢ্যাঙা টুলের মত আসনও আছে। অথচ মদের কোন গন্ধ নেই। আতরের মত অদ্ভুত মিহি সুবাস, সম্মুখেই যুবতীজনের সাহচর্যে, উপস্থিত কোন অসম্ভব দূর যুগের হারেমের একটি কোণ!

মেয়েরা আমাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন। আবু শিপ আমার জন্য এদের কাছে যেন সহসা অচেনা হ'য়ে উঠলেন, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের উপর বুলিয়ে, একজন তরুণীর সামনে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"ইনি রহমান, আর ইনি ফাতিন হামামা—মিশরী চলচ্চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।"

আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ফাতিন বললে,—"যদি তাই হয় তা'হলে উনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক—অনুগ্রহ করে সব বসুন এবং কি পান করবেন বলুন।"

অনুরোধটি খুব স্বাভাবিক, খুবই সাধারণ—তবু বড় ভাল লাগলো তার বলার ঢঙ আর আত্মীয়তার সুর। ফাতিন চমৎকার ইংরিজি বলে। আশ্বস্ত হলাম ভেবে, খানিকটা সময় অন্ততঃ কাটিয়ে দেওয়া যাবে আলাপ করে। বললাম, "—আপনি বলুন—"

"—আপনি অতিথি।" কথাটার পিছনে একটা ধমক ছিল। আরব আতিথেয়তা যে কি আড়ম্বরপূর্ণ, তখনও ভালভাবে জানা হয়নি। অজ্ঞাত কুলশীলকে এদের মত নিঃসঙ্কোচে কেউই আপনার করে নিতে পারে না।

আবু শিপ বাধা দিয়ে বললেন, "—ফাতিন, রহমান আমার অতিথি—তোমার নয়।"

ফাতিন বললে—"সে হবেনা, উনি আজ আমার অতিথি।"

আবু শিপ আর ফাতিনের তর্কে আমি যেন থৈ পেলাম। নিজেকে সাকার ভাবতে পারার মধ্যে বেশ একটা আত্ম-প্রসাদ আছে এবং এতে বেশ আনন্দও পাওয়া গেলো। ফাতিনের লাজুক অথচ স্পষ্ট ব্যবহারে কখন যে সহজ হয়ে গেছি তা লক্ষ্য করিনি। ওর কথাবার্তায় ব্যবহারে মনে হলো না যে সে কোনো লিখিত সিনারিও মাফিক কথা কইছে। আবেগ যেটুকু ছিল সেটুকু খাঁটিই।

পার্শ্ববর্তী আবহাওয়ার দিকে নজর পড়তেই বুঝলাম, অপরিচিত পরিবেশ তখনও তেমন গা সওয়া হয়নি। হঠাৎ ফাতিনের গলার স্বরে চমক ভাঙ্‌লো। সে বললে—"কি খাবে বল?"

"—কোনো মদ নয়।"

"—আমরা কেউ তা খাচ্ছিনা।"

এবার অপ্রস্তুত হবার পালা। ঠিক বুঝতে পারিনি, পরে লক্ষ্য করলাম পুরুষেরা গেলাসে গেলাসে পিঙ্গল তলানি নিয়ে বসে, তখনি তৎপর হয়ে কি বলতে যাবো এমন সময় আবু শিপ বললেন—"ও, গান্ধীর দেশের লোক কিনা--" বলে হাসলেন।

এ-কথার উত্তরে আমি বললাম—"সে-টাই আমার পরিচয়—তার উপরে তোমাদের দেশতো মুসলমানের।" উত্তর অমোঘ হলো। ফাতিন আর তার সঙ্গিনীরা হৈ-হৈ করে উঠলো। ফাতিন আবু শিপকে বললো,—"দেখ, শুনলে" বলেই হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

ফিল্ম অভিনেত্রীকে আমরা কতটুকুই বা জানি, বা জানতে পারি, বিশেষতঃ যদি সে ফাতিনের মত অভিনেত্রী হয়—সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, বয়সে নবীনা। ফাতিন শুধু মাত্র মেকাপে সুন্দরী নয় যথার্থই সুন্দরী। শুধু এইটুকু আপসোস হচ্ছিল এত কাছে এসেও ফাতিন কি অজানা থেকে যাবে?

ও জিজ্ঞাসা করলে—"আমার ছবি দেখেছো?" সায় দিলাম।

—"কেমন লাগলো?" প্রশ্নের পিছনে দু'জোড়া চোখ, দেখেই আমার হাতের মুঠো হয়ে গেলো মিথ্যা মুষ্টি।

একটু মুশকিলে পড়লাম। 'কেমন লাগলো' প্রশ্নে, ও কি ভাবছে আমি সাংবাদিক? আর যাই হোক মানুষকে সাংবাদিক ভাবলে যে কোন পাসপোর্টধারী লোকেরই মনে এবং মানে লাগে। কষ্টটা কাটিয়ে বললাম,—"তোমার অভিনয় আমায় মুগ্ধ করেছে।" 'চার্ম' কথাটা ব্যবহার করে-

সামীরা আহমেদ।

মাগদা কামেল।

ছিলাম, আমার অভিপ্রায় আবু শিপ বুঝতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ ফাতিন যে এভাবে কঠোর উক্তি করবে তা আমি কখনই ভাবতে পারিনি। সে বলেছিল,—"সব ভারতীয়ই কি তোমার মত চালাক?—" কথাগুলো একটার পর একটা তার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়েছিল।

আমার এ সময়ের অসহায়তা দেখবার জন্য অন্য কোন ভারতীয় সেখানে উপস্থিত ছিলো না। আমি যে কোথায় তা আমিও জানি না।

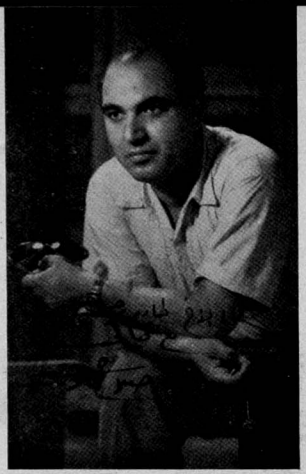

সালাহ আবু শিপ।

আবু শিপ আবহাওয়াকে হয়তো হাল্কা করবার জন্যে বলেছিলেন, বুফে ডফ—অর্থাৎ আমার অরেঞ্জ স্কোয়াস পানের অনুরোধ।

অরেঞ্জ স্কোয়াসে একটা চুমুক দিলাম, এবার আর এক জনের অনুরোধ—"মিঃ রহমান তুমি নিশ্চয়ই ডিনারে আসবে,—না বলো না।"

'নিমন্ত্রণ! জানি না 'হাঁ' বললাম অথবা 'না'।

আবু শিপ আমায় হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। লিফ্‌টে ঢুকে নিজের উপরই রাগ হতে লাগলো। মনে হলো আবু শিপের উচিত হয়নি আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া। অবশ্য একটু ভাবলে দেখা যাবে যে আমারই উচিত হয়নি সেদিন কাফেতে বসে জলদ গম্ভীর ভাষায় সিনেমা সম্পর্কে বাণী দেওয়া!

মাত্র দু'দিন আগে এক রেস্তরাঁয় ব্যাপারটা ঘটেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ টেলিফোন—"আল-মুসাওয়ারের" আউদা ডাকলো,—"রহমান, লক রেস্তরাঁয় আমরা আছি, এস আড্ডা হবে।"

লক রেস্তরাঁ। মিদান সুলেমান পাশা-র লক, ভিয়া ভিনিতোর কাফে স্ট্রাগা আর ১৯৪১-৪৪ সালের চৌরঙ্গীর কাফে-ডি-মনিকো প্রায় একজাতের। অতি-প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী, পুলিশের চোখ এড়ানো তরুণ রাজনৈতিক কর্মী, রুপোলী পর্দার মোহ আকৃষ্টা সুগঠিত-দেহ তরুণী, আর বড়লোক পিতার—শ্রেণীহীন পুত্র-কন্যাদের ভীড় এখানে। আউদা জেলফেরত তরুণ সাহিত্যিক লুৎফীকে নিয়ে বসে আছেন। সামনে টেবিলে বিছানো 'আলআকবর' খবরের কাগজ। ওরা বললে—"দেখ আজকের কাগজ কি লিখেছে।" শিরনামা ছিল—'ভারতীয় চলচ্চিত্রের তুফান।' অর্থাৎ 'আন' আর 'দো বিঘা জমিন' এখানে ভাল টাকা কামিয়েছে। এখন প্রতিমাসে দু'একটি করে ভারতীয় ফিল্ম আসবে মনে হয়—এবার মিশরীয় চলচ্চিত্র রসাতলে যাবে। এখন সকলেই এই ধরনের ছবি তোলার কথা ভাবছে ইত্যাদি খেদোক্তিতে দু'কলম ভরা। খানিকটা বিনয়ে অবনত হয়ে বললাম, "তাতে দোষই বা কি? শুনেছি যা, তাতে মনে হয় তোমাদের ছবি-যা হচ্ছে, তা ভারতে বছর পনরো-কুড়ি আগে প্রচুরভাবে হতো। বাঁধা ছক্—গ্রাম্য বালিকা, সঙ্গী যুবক। যুবক এলো শহরে, হাত-ব্যাগে বন্দী হলো, এবং অবশেষে কোন উপায় মুক্ত হ'য়ে গ্রাম্যপথে। বালিকার বয়স বাড়েনি, মন একই আছে—তখনও সে প্রতীক্ষামানা। নয়তো শ্বশুর-শাশুড়ী কিম্বা অনাথের উপর অত্যাচার, অথবা অবলা বালিকা আর তার প্রতারক সঙ্গী গে লোথারিও ধনীর দুলাল—কিম্বা আর একটু নূতন, যথা অতীতের ভয়ে শঙ্কিতা রমণী……ইত্যাদি। আমার মনে হয় যদি আরও ছবি আসে তো ভালই হয়, অন্তত লোকের রুচি ফিরবে। মিশরের রুচি ভারত ফেরাবে এতে অন্যায়ের কি আছে বল?"

লুৎফী বললে,—"তর্কটা বে ঝুটপুট—চলো এ বিষয়ে যিনি কিছু জানেন এবং বোঝেন তার সঙ্গে আলোচনা হলে ভাল হত। সালাহ আবু শিপের কাছে যাওয়া যাক।"

সঙ্গে সঙ্গে আবু শিপের অফিসে ফোন। বেরিয়ে গেছেন কিছু আগেই, এর মধ্যে রাত এখন ১১টা মাত্র। খবর রেখে দেওয়া হলো কাল সকালে আমরা যাবো। কথা হলো-লুৎফী ত' আসবেই; সময় পেলে আউদাও যাবে।

লুৎফী ঠিক সময়ে এসে হাজির। আউদার পাত্তা নেই, লুৎফী বললো সে গেছে মাগ্‌দাকে ধরে আনতে।

(মাগদা কামেল মিশরের অন্যতম নামকরা চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী। ভারত, বিশেষ করে ভারতীয়দের প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন। এক সময়ে নাকি পানিকর সাহেব এঁকে নিয়ে ভারতে ফিল্ম তোলার প্রস্তাব করেছিলেন।) আউদা অভাবে আমরা দু'জনেই গেলাম অল হিলাল ফিল্ম কোম্পানীর অফিসে। পাঁচতলার উপরে, পরিপাটি অফিস। সামনেই মীনা কুমারীর ছবিওয়ালা হিন্দী ফিল্ম 'আলিবাবা'র প্রকাণ্ড পোস্টার। আলাপ হলো মহম্মদ শোভীর সঙ্গে। এককালে সাংবাদিক

লুৎফী আল খোলী।

সামীয়া গামাল

ছিলেন ইদানীং সিনারিও লেখক। কিছু বাদে ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকতেই, এক সুবেশ ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে হাসি-মুখে দরজার কাছে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—'আহলান' 'আহলান' (আসুন আসুন) হিন্দী ভাইয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

ইনি আবু শিপ। আলাপ জমলো। কাফের পুরানো কথা আবার উঠলো। আবু শিপের সরল একটি প্রশ্নে আমি তটস্থ। স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। শিপ প্রশ্ন করেছিলেন একটা ভারতীয় ছবি তুলতে কত খরচ লাগে। এইটুকু জানি যে ভারতে যে কোন সাধারণ ফিল্ম করতে তিন চার লক্ষ টাকার মত লাগে।

শুনলাম এখানেও প্রায় তাই খরচ হয়। সাধারণ ছবিতে প্রায় ত্রিশ হাজার মিশরী পাউণ্ড লাগে। একটি ফিল্ম-তোলা শেষ হতে তিন থেকে পাঁচ মাসের মত সময় নেয়। ছবি প্রতি নায়ক পান চার হাজার পাউণ্ড, নায়িকা পান পাঁচ ছয় হাজার। শুনলাম, এক কায়রো শহরেই আছে ন'টি স্টুডিও, এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্টুডিও চারটি, মিশির, আহরাম, নাহাস, গালাল। দশটি প্রথম শ্রেণীর ফিল্ম কোম্পানীও আছে যারা নিয়মিত ফিল্ম তোলে তার মধ্যে আল হিলাল, নাইল এবং এশিয়াই বিখ্যাত।

বিমল রায় সম্পর্কে দেখলাম আবু শিপের ভারী উৎসাহ। 'দো বিঘা জমিন' দেখে উনি একেবারে মুগ্ধ। ওঁর ধারণা, নাম আর অর্থের মোহ থেকে বিমল রায় যদি নিজেকে বাঁচাতে পারেন তাহলে তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলে নাম করতে পারবেন। এবার আমাদের আলোচনার মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন জার পেনেলী। ইনিই অল হিলাল কোম্পানীর মালিক, জাতিতে গ্রীক। পুরুষানুক্রমে মিশরের বাসিন্দা। চমৎকার চেহারা আর তেমনি আলাপী। এক জার্মান ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে আধা-আধি ভাগে কায়রোতে আরবী এবং জার্মান ভাষায় ফিল্ম তুলছেন। ভারতে গিয়ে তাঁর ফিল্ম তোলার খুব ইচ্ছা। সেই ছবি ভারত এবং মিশরের পটভূমিকায় তোলা হবে। নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন মিশরী অন্য জন ভারতীয়। অর্থের দিক থেকে তিনি অর্ধেক দিতে সব সময়ই প্রস্তুত এবং বাকি অর্ধেক তিনি ভারতীয় প্রযোজকের কাছ থেকে

আশা করেন। আরবী এবং হিন্দুস্থানী ভাষাতে ছবিটি তোলা হবে। "কোনো প্রযোজক কি রাজী হবেন"—প্রশ্ন করলেন।

এই আল হিলাল অফিসে সামীরা আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আবু শিপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তারপর এই রেস্তোরাঁয় ফাতিনের সঙ্গে পরিচয়।

মিশর এক অদ্ভুত জায়গা। সাহারার আর এক পারেই তো উন্মাদ বীভৎস জঙ্গল। দাঁতের আর নখের পৃথিবী। শুনেছি হাড় নাকি প্রান্তরের সবুজতা আনে, ভূটার দানায় মুক্তাফলের নিটোলতা, এবং অন্যক্ষেত্রে গোলাপে রঙীন বাহার ঘন করে তোলে। ইস্পাতের আওয়াজের রেশ আজও এখানে আছে। বহু যুদ্ধ হলো, বহু হাড় চূর্ণ হয়ে গেছে, তবু কই সেই সবুজতা নবোঢ়া হরিত! শুধু বাদামী বালুরাশি। ক্রমশঃ সাহারা এগিয়ে চলেছে—বহু সবুজ প্রান্তর শুষবে।

পিরামিড রোডের উপর দিয়ে গাড়ি চলছে। সন্ধ্যার আকাশে আলো ও আঁধারের খেলা চলছে। মিশরের সন্ধ্যার আকাশ অপূর্ব অদ্ভুত। কখনো লাল, কখনো ভাঙা সোনার রং, তারপর ধূসর হয়ে হঠাৎ কালো অন্ধকার নেমে আসে। শিপ মুখেচাপা রুমাল সরিয়ে বললেন—"ভোয়ালা, ওবেয়ারজ্ দ্য পিরামিড-নাইট ক্লাব।"

রাতের উন্মাদনা যেন এখনই এলো। বুক তোলপাড়। এখন রাত নয়, গভীর রাত্রে নাকি অদ্ভুত। এখন যদিও আলো নেই তবু ক্যামেরায় তোলা ছবির মত সব স্পষ্ট। তারা যখন অগণন তখন যেন আরো স্পষ্ট হয়, রূপকথার নানান বিলাস নাকি জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে, মানুষকে প্রথমে লাল করে দেয়, তারপর সে নীল হয়ে যায়, চকিতে ঝটিতে যা কিছু অঙ্গাভরণ আছে তা কেড়ে নেয়। সারা রাত ধরে ইস্তিরী দোমড়ানো চলে, বাজনা বাজে, সারারাত সরাব চলে।

কায়রো এ ধারেই এক নূতন পল্লী গড়ে তুলছে। এ পল্লী অত্যন্ত অভিজাত। প্রায় সব বাড়ি নূতন কায়দায়, কোনটি স্পানিশ কোনটি ফরাসী কায়দায় নির্মিত।

গাড়ি চলেছে। খুরওয়ালা টায়ার উৎসারিত ধূলো উড়ে উড়ে যায়, পিছনে ধূসরতা তথা মেঘ সৃষ্টি করে। দু'পাশেই ধনীদের বাড়ি আর একটু পরেই বড় রাস্তা ছেড়ে আমাদের গাড়ি ছোট একটি নিচু রাস্তায় বাঁক নিল। সামনেই গেট-ওয়ালা বিরাট বাড়ি—অল আহ্ রাম স্টুডিও। গাড়ি থেকে নেমে আবু শিপের পিছন পিছন চলছি। এর মধ্যেই কখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে। শহর থেকে খানিকটা দূরে চলে এসেছি। চারিদিকে সব চুপচাপ সামনের যা-কিছু তা একেবারেই চোখে পড়ছে না। এমন সময় শুনলাম—আবু শিপের গলায় ধ্বনিত হলো, "মামজেল গামাল! মসিঁয়ে রহমান।" চোখ খুলে ভালভাবে তাকালাম, ইংরাজীতে যাকে বলে 'শক অফ রেড হেয়ার্স'—লালচুলের রাশ, বাতাসে একটি রেখা অন্য আর একের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। অতি লাল জাফরান একটু ছায়ায় দেখলে যেমন দেখতে হয়, তেমনি। দেহভঙ্গিমা অতুলনীয়—আমার যদি এর আগে মরালের গতি লক্ষ্য করা থাকতো—তা'হলে অনায়াসেই আমি হলফ করে বলতে পারতুম এ গতিভঙ্গীমা মরালের।

মেয়েরা বিশেষ করে যারা খুব শৌখিন, তারা পরিচিত হবার আগেই খুট করে হাত-ব্যাগ খুলে, শেষ পোচটা মুখে বুলিয়ে দেয় দেখেছি কিন্তু সামিয়া গামাল সে জাতের নয়, দেখে মনে হয় নেহাতই শান্ত ভদ্র একটি তরুণী।

পরিচয় হবার পর সামিয়ার প্রথম প্রশ্ন,—"আমার ছবি দেখেছো?"

"—নিশ্চয়ই, তাই তো ভাবছি, ছবির সামিয়া আর সামনের সামিয়ার মধ্যে অনেক তফাত।"

"—একথা সবার পক্ষেই খাটে, আমার সবটুকুই সিনেমায় যেতে পারেনা, তাই অনেকটা নিজস্ব থেকে যায়।"

এর উত্তরে মনে হলো, আজ যদি তার যৌবন চলে যায়, তবে তাকে রূপোলী পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু তবুও গামাল সগর্বেই বেঁচে থাকবে। সে যে অনেকটাই নিজের জন্যে রেখেছে। সব কিছুই নিঃস্ব হ'য়ে বিলিয়ে দেয়নি। আজ কোথাও সে শুধুমাত্র নারী চরিত্র—মামজেল গামাল নয়। কোথাও সে প্রতিহিংসা পরায়ণা, কোথাও প্রণয়িনী, কোথাও সে স্নেহপরায়ণা নারী। কিন্তু গামাল ঠিক কথাই বলেছে--যে নারীস্নেহ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে অথবা যে প্রণয়িনী মাল্যদানে প্রণয়ীকে প্রাণদান করে, তার কতটুকু কথা সিনারিও লিখতে পারে! ষাট-নব্বুই মিনিটের নারী চরিত্র এক, আর প্রস্তর যুগ থেকে

আবু শিপ পরিচালিত "রায়া এবং সকিনা" ফিল্মের আউটডোর শুটিং-এ কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে পরিচালক

আজ পর্যন্ত নারী চরিত্র আর এক। স্ত্রী ভূমিকায় সামিয়া গামাল অংশ গ্রহণ করেছে শুধু, তার অপূর্ব নাচ দেখিয়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহকে অবাক উন্মাদ করেছে কিন্তু কোথাও সামনের এই তন্বী মেয়েটি ধরা পড়েনি।

অনেক কথা হলো। অনেক আলাপ হলো। আলাপ প্রায় বন্ধুত্বের সীমানায় এসে ঠেকতে চাইলো, অবশ্য সবটাই ব্যক্তিগত, অন্যের কাছে তার কোনও মূল্য নেই। ভালো-লাগার যেন শেষ নেই, এই ফাতিন ওই সামীরা আবার সামিয়া! কবি হলে কাব্য করে বলতাম—সামিয়া গামালের গাম্ভীর্য, ভাবালুতা, সব কিছু যেন নিশরীয় পুরাতন-দিনের কোনো রাত—আজ মেয়ে হয়ে জন্মেছে!

আমরা ছোট একটি ঘরের মধ্যে গেলাম। আবু শিপ বললেন—"এটা প্রজেকশন রুম।" কার্পেটে মোড়া শৌখিন বসবার ব্যবস্থা, ছবি সুরু হয়ে গেল। সামিয়া গামালের কানের গহনা, জার পেনেলীর্ সিগারেটের ধোঁয়া, আবু শিপের আগ্রহ, সবকিছু অন্ধকারে এক হয়ে গেছে।

প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য

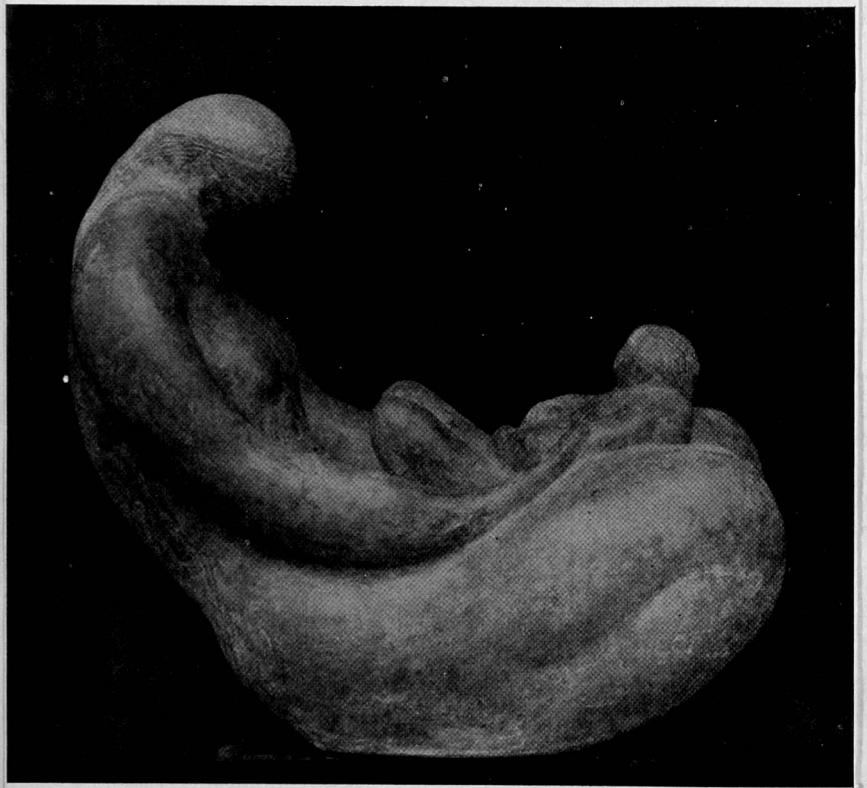

ক্রেডল

প্রদোষ দাশগুপ্তের স্কেচ

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

আমাদের দেশের ভাস্কর্য নিয়ে গর্ব করতে গেলে তেরশ' শতাব্দীর এদিকে এগোবার যো নেই। হারাপ্পার যে আশ্চর্য টোরসো দিয়ে ভারতীয় ভাস্কর্যের সুরু বৌদ্ধযুগে যার মধ্যাহ্ন, কোনারকে তার অবসান বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

যদিও এখানে ভারতীয় ভাস্কর্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় তবুও বোধহয় এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষের পুরাতন শিল্পগুলির মধ্যে ভাস্কর্যই সবচেয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে ধর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল, তার অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি ধর্ম-নির্ভর ছিল। নাচ গান বা ছবি আঁকা ঠিক কোরান-সম্মত না হোলেও পাঠান সুলতান ও মোগল বাদশারা এই শিল্প-গুলির চর্চায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু তাঁরাই আবার বহু মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী করেছেন এবং মূর্তি কাঁদা ধর্ম-বিরোধী বলে তা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ফর্মান জারী করেছেন। এই সব নানা কারণে সনাতন হিন্দুধর্মের বাঁধন শিথিল হ'য়ে গেলে ভাস্কর্য এলোমেলো হয়ে পড়ে এবং তার ধারায় ছেদ পড়ে। তারপরে ইংরেজ আমলে মূর্তি গড়ার বিরুদ্ধে আইন-কানুন জারী না হলেও ভাস্কর্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এর কারণ ইংরেজ আধিপত্যে স্থাপত্যের মূল চেহারা পাল্টে যায় এবং সেখানে ভারতীয় ভাস্কর্যকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়নি। তাই সরকারী বাড়ি-ঘর, বড় লোকদের প্রাসাদ, রাস্তা ও পার্ক সাজানোর জন্যে বিদেশ থেকে মার্বেল ও ব্রোঞ্জের মূর্তি আসতে সুরু করল।

বিশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেল সাহেব ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে শিল্পী ও রসিক মহলে সবিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন তখন তা কেবলমাত্র চিত্রশিল্পের জগতেই আবদ্ধ থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল আমরা এখন বেশ বুঝতে পারছি। এতদিন অবধি আমাদের আর্টস্কুলগুলিতে ছবি আঁকার ক্লাশে জায়গা না কুলোলেও ভাস্কর্য খুব কম শিক্ষার্থীকেই আকৃষ্ট করেছে। তাই আজ যদি কেউ ভারতবর্ষের ভাল ভাল ভাস্করদের নামের ফিরিস্তি করতে বসেন, তা হ'লে তিনি দেখবেন, যে সেই ফিরিস্তিটা খুব লম্বা হবে না।

এই মুষ্টিমেয় ভাস্করদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত। প্রদোষবাবু ১৯১২ সালে ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে কি. এ. পাস কোরে তিনি ভাস্কর্য শিখবেন বলে ঠিক করেন। প্রথমে লক্ষ্ণৌ-এ এবং পরে মাদ্রাজে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে শিক্ষা শেষ করে প্রদোষবাবু বিলেতে রয়েল অ্যাকাডেমিতে যোগদান করেন সেখানে প্রফেসার ম্যাকমিলানের কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় ফিরে প্রদোষবাবু স্বাধীন ভাবে কাজ করার জন্য তাঁর স্টুডিও খোলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য ফটো থেকে ব্যক্তিবিশেষদের প্রতিকৃতি করা ছাড়াও তিনি নিজের মনমতো ভাস্কর্য চর্চা সুরু করলেন। এই সময় তিনি, সুভো ঠাকুর, নীরোদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, কমলা দাশগুপ্তা, এই কয়েকজন শিল্পী মিলে ক্যালকাটা গ্রুপ-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় প্রদোষবাবুর কাজের প্রথম

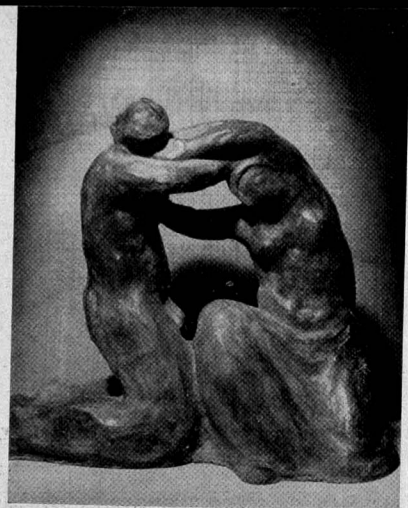

দি ডেভিল এণ্ড দি ডেম্ ও রিমোর্স অব দ্যান এগ।

একক প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনী সমালোচক ও রসিক মহলে বেশ সাড়া আনে। সকলেই স্বীকার করেন যে বহুদিন পরে বাংলা দেশে একজন শক্তিমান ভাস্করের আবির্ভাব হোলো।

গত পনরো বছরে প্রদোষবাবুর কাজ অনেক প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। প্রদোষবাবু এখন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসেবে স্বপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রথম যুগের কাজ ও আজকের কাজের মধ্যে ধরনধারণ, বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ইত্যাদির দিক থেকে নানা রকম অদল বদল হয়ে গেছে। এই ক্রমপরিণতি প্রদোষবাবুর শিল্পী জীবনে খুবই অর্থপূর্ণ এবং এই দিক থেকে না দেখলে তাঁর কাজের মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অল্পদিন হোলো, প্রদোষবাবুর গত পনরো বছরের কাজের একটি বই বেরিয়েছে। তাঁর এই বইতে তিনি নিজের কাজ এবং তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশ সবিস্তারে ও সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রদোষবাবু বলেন যে ১৯৪০ সালে যখন তিনি স্বাধীন-ভাবে ভাস্কর্যের চর্চা সুরু করেন তখন তিনি অ্যাকাডেমিজম্ —এর প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। মডেল দেখে হুবহু প্রতিকৃতি করার দিকেই বেশি চেষ্টা ছিল। এই সময়কার কাজগুলো সম্বন্ধে তিনি বর্তমানে খুব উৎসাহী না হ'লেও একথা অনস্বীকার্য যে বাস্তবধর্মী ভাস্কর্যের দিক থেকে এগুলিতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক লোকে আধুনিক শিল্পীদের সম্বন্ধে নালিশ করেন যে, যারা কোন সামান্য জিনিসের হুবহু চেহারা আঁকতে বা গড়তে হিমশিম খায়, তারাই অ্যাবস্ট্রাকট আর্ট নিয়ে নানা ভাবে ওস্তাদী করে। কথাটা হয়ত কোন কোন আধুনিক শিল্পী সম্বন্ধে খাটে। প্রদোষবাবুর গোড়ার যুগের কাজগুলো দেখলে বোঝা যায় যে তাঁর ডিস্টর্শান-এর অধিকার আছে।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে প্রদোষবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি করার জন্য শান্তিনিকেতন যান। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-

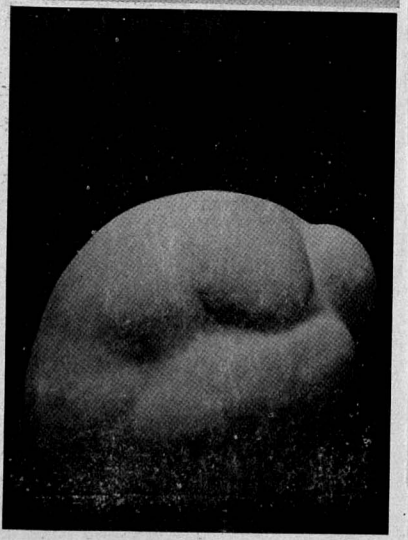

কার প্রদোষবাবুর শিল্পী জীবনের বড় ঘটনা। দুজনেই তাঁর কাজের ছবি দেখে তাঁর ক্ষমতার তারিফ করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন—যে, কেবল 'স্টাডি' করাই একজন ভাস্করের সব কাজ নয়। তাকে নিজের মতন ক'রে দেখতে শিখতে হবে, ভাবতে শিখতে হবে এবং গড়তে শিখতে হবে। তবেই সে শিল্পী হ'তে পারবে। রবীন্দ্রনাথ আর নন্দলালের কথা প্রদোষবাবুর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। ১৯৪৩ সালের পর তাঁর কাজের ধারা ও চেহারা বদলাবার মূলে তাঁদের এই উক্তি কম সাহায্য করেনি। প্রদোষবাবুর এই সময়কার কাজগুলোয় দেখা যায় যে তিনি কম্পোজিশান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁর ভাস্কর্যে স্বকীয়তা প্রকাশ পেতে সুরু ক'রেছে। এই সময় বাংলা দেশের বড় দুর্দিন। যুদ্ধ,

'প্রদোষ দাশগুপ্ত'—শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা নির্মিত একটি মূর্তি।

দুর্ভিক্ষ, চতুর্দিকে অন্নের জন্যে হাহাকার ও মৃত্যু। ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লোকেরা জীবনপণ করে লড়াই করছিল। এই সকল জিনিস মানুষের মনে গভীর আলোড়ন আনে। প্রদোষবাবুর এই সময়কার কাজে আমরা এই পরিবেশের বেশ সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। তাঁর 'ফুডকিউ' বা 'চালের লাইন' ও 'ইন বণ্ডেজ' বা 'বন্দীজীবন' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কাজটি বহু সমালোচক প্রদোষবাবুর একটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলে মনে করেন। পরাধীনতার গ্লানি ও বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা বলিষ্ঠ ভাবে গড়া এই মানুষের মূর্তিতে খুব পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রদোষবাবুর

মতে যদিও তিনি এগুলি গড়বার সময় তার ভাস্কর্যের নিজস্ব গুণ ও বিশিষ্টতার দিকে নজর রেখেছিলেন তবুও এগুলোর মধ্যে ভাস্কর্যের নিজস্ব ভাষার চেয়ে বক্তব্য বা গল্পের ভাবটা যেন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রদোষবাবু সেইজন্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁর কাজকে আরও সহজ ও সরল করে আনার চেষ্টা করেন। কতকগুলো নীরেট এবং স্থূল ফর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া বিষয়কে ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টা সুরু করেন।

এর পর থেকে প্রদোষবাবু ম্যাস্ ও ভল্যুম নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। ১৯৪৬-৫০ সাল তাঁর শিল্পী জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই সময়েই তিনি কঠোর চেষ্টার ফলে তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল অ্যাকাডেমিজম্‌কে নির্মূল করতে সমর্থ হন। এই মুক্তির জন্য প্রদোষবাবুকে তাঁর নিজের সঙ্গে যে আপ্রাণ লড়াই করতে হয় তার চিহ্ন আমরা তাঁর কাজের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন 'ডেভিল অ্যাণ্ড ডেম' বা শয়তান ও নারী। এই কাজটি বক্তব্যমূলক কিন্তু এটিতে বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কম্পোজিসনের দিকে সমান নজর রাখা হয়েছে যা হয়ত তাঁর আগের কয়েকটি কাজের মধ্য ছিল না। ডেভিল অ্যাণ্ড ডেম কাজটির কম্পোজিসনের মজা হ'ল একটি টানা লাইন। এই ভাস্কর্যটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই লাইনটি শয়তান-পুরুষটির পায়ের আঙুল থেকে সুরু হয়ে স্ত্রীলোকটির বাম উরু দিয়ে তার পায়ের আঙুলে শেষ হয়েছে এবং এইটিই ভাস্কর্যটিকে ছেঁদে-বেঁধে রেখেছে।

প্রদোষবাবুর এই সময়কার শেষের দিকের কাজ-গুলোয় দেখা যাচ্ছে সেগুলি ডিম্বাকৃতি, গোল এবং সিলিণ্ড্রিক্যাল হয়ে আসছে। যেমন ধরা যাক—'রিমোর্স অব অ্যান এগ্'। এই ভাস্কর্যটিতে প্রদোষবাবু মানবজন্মের দুঃখের কথা বলতে চেয়েছেন। জন্মের পর মানুষ পৃথিবীতে যে দুঃখ, দারিদ্র্য ও ক্লেশের সম্মুখীন হয় তারই কথা ভেবে যেন জন্মের আগে মুহ্যমান মানবকে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। প্রদোষবাবু একটি ডিম্বাকৃতি মার্বেল পাথরে সামান্য কাটাকুটি কোরে একটি মানুষকে রূপদান করেছেন। যদিও এই ভাস্কর্যটি মূলতঃ ফর্মধর্মী তবুও এখানে বক্তব্যেরও

একটা সুস্পষ্ট স্থান রয়েছে, কিন্তু তাকে স্থূল ফর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত পাঁচ বছর ধরে প্রদোষবাবু যে কাজগুলো করছেন সেগুলি মূলতঃ ফর্মাল এবং অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ভাস্কর্য—তাতে গল্প নেই, বক্তব্য নেই। ম্যাস ও ভয়েড, কনকেভ ও কনভেক্স, কোন্ ও লাইন—এই গুলির পারম্পর্য হ'ল এই ভাস্কর্যগুলির মূলকথা। এগুলির প্রেরণা জুগিয়েছে এধারে ওধারে ছড়ানো ছোটখাট জিনিস—যেমন গাছের ঝরা পাতা বা এক টুকরো স্প্রিং, ঘোরানো সিঁড়ি বা মাটির কলসী, গাছের গুঁড়ি বা ডাল ইত্যাদি। এইগুলি দেখে প্রদোষবাবুর যে ফর্মগুলোর চেহারা মনে এসেছে সেগুলিকে তিনি হয় মানুষের আকৃতির মধ্যে দিয়ে কিম্বা খাঁটি অ্যাবস্ট্রাক্সানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই সময়কার কাজগুলোর মধ্যে 'লুপহোলস্' উল্লেখযোগ্য। লুপহোলস্-এ ম্যাস্ ও ভয়েড পাশাপাশি সাজিয়ে এক সমগ্রতার সৃষ্টি করা হয়েছে; মূর্তিটির ফাঁকা অংশগুলি ভাস্কর্যটিকে একীভূত করতে সাহায্য করেছে।

গত দু'চার বছরের মধ্যে প্রদোষবাবু ঘরের বাইরে রাখবার জন্যে যে কয়েকটি ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন লুপহোলস্ সেগুলোর মধ্যে একটি। ভাস্কর্যের রূপ পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। তাই সীমাবদ্ধ ঘরে রাখার জন্যে যে ভাস্কর্য তার সঙ্গে এই কাজগুলোর অনেক তফাত। এগুলো তৈরী করার সময় প্রদোষবাবুকে মনে রাখতে হয়েছে যে এগুলি থাকবে বিরাট আকাশের তলায় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। আলো হাওয়ার পরিবর্তন, সূর্যের কড়া রোদ থেকে চাঁদের জোৎস্না, ঝড়বৃষ্টি, গাছের সবুজ আর আকাশের নীল, পাখীর ডাক আর সমুদ্রের গান—এগুলির সঙ্গে যাতে খাপ খাওয়ানো যায়, যাতে এই সমস্ত পরিবেশে ভালো দেখায়, সেই ভাবে প্রদোষবাবু এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রদোষবাবুর কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর তৈরী হেডস্ বা প্রতিকৃতির কথা বলা প্রয়োজন। তাঁর প্রতিকৃতি-গুলোর মজা হোলো যে তাতে ব্যক্তিবিশেষের চেহারার সাদৃশ্য বজায় রেখে তাঁর চেহারার মধ্যে বিশিষ্ট জিনিসকে ডেকোরেটিভ্ ভাবে প্রকাশ করা। তা ছাড়া বলা বাহুল্য

দি ক্যাক্টাস ফ্যামিলী।

বাগানের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত 'লুপ হোল্স'।

বেদনামণ্ডিত যীশু খৃষ্টের মুখ—'হেড অব ক্রাইষ্ট'।

'গসিপ্' বাংলা ভাষায় যাকে পরচর্চা বলে।

তেরশ' তেষট্টি ॥

তিনি তাঁর সীটার-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বকেও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। ভাস্কর্য ছাড়া প্রদোষবাবুর কিছু স্কেচ্ তাঁর নতুন বই-এ প্রকাশ করেছেন। এই স্কেচ্গুলি হ'ল তাঁর ভাস্কর্যের আরম্ভ, অর্থাৎ প্রথম খস্ড়া। এগুলিতে তিনি প্রথমে তাঁর নতুন কাজের ভাবটা ছকে নেন। কিন্তু বলা বাহুল্য এই স্কেচ্ থেকে ভাস্কর্যের সম্পূর্ণ চেহারাটার আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। এইগুলি থেকে তিনি মাটির ছোট ছোট মডেল তৈরী করে নেন। প্রদোষবাবুর স্কেচ্গুলির বিশেষত্ব হ'ল জোরদার লাইন, ছন্দোময় গতি এবং সারল্য।

প্রদোষবাবুর কাজের সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচকদের মত যে, তা খানিকটা পরধর্মী, তাতে বিদেশী প্রভাব একটু প্রকট। এর জবাবে প্রদোষবাবু বলেন, যে, তিনি নিজে তাঁর কাজে খাঁটী ভারতীয়ত্ব দাবী করেন না এবং তাঁর মতে কোন শিক্ষিত শিল্পীর পক্ষেই বোধহয় তা দাবী করা সম্ভব নয়। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি। একটি হোল যে ভারতীয় শিল্পের মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিল্পীদের যোগাযোগ আজ কয়েক শতাব্দী হ'ল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, আজকের পৃথিবীতে যে কোন দেশের যে কোন শিল্পী চান বা না চান তাঁর অগোচরে নিজের

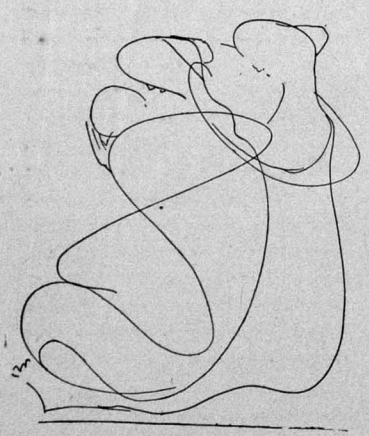

দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের অন্যান্য শিল্পকলা দ্বারাও প্রভাবান্বিত হ'তে বাধ্য। উপাদান, আঙ্গিক ও খানিকাংশে মনোভাব এই তিনটির মধ্যে দিয়েই এই প্রভাব প্রকাশ পায়।

তাই প্রদোষবাবু বলেন যে তাঁর অনেক কাজের মধ্যে তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে তার সঙ্গে খাপ খায় এমন ধরনের বিদেশী প্রভাবকে হুঁশিয়ার ভাবে মিশ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন ধরা যাক তাঁর অ্যাব্স্ট্রাক্ট কম্পোজিসানগুলির কথা। এগুলিতে, কম্পোজিসানে আধুনিক ভাস্কর্যের বিজ্ঞানসম্মত আঙ্গিকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আঙ্গিক দিয়ে যে মূল ফর্মের সৃষ্টি করা হয়েছে তা ভারতীয়। প্রদোষবাবু তাঁর ভাস্কর্যগুলিতে যে ফর্মগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তা হ'ল ওভয়ড্, স্পেহ্রিক্যাল ও সিলিণ্ড্রিক্যাল। তাঁর কাজের মধ্যে কিউব-এর ব্যবহার নেই। ভারতীয় ভাস্কর্যের যে কোন অনুরাগীই জানেন যে প্রথমোক্ত তিনটি ফর্মই ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল উপজীব্য, তা'তে শেষোক্ত ফর্মের স্থান নেই। প্রদোষবাবুর নারীমূর্তিগুলিও একান্ত ভাবে ভারতীয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'গশিপ্' ভাস্কর্যটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরনিন্দা ও পরচর্চা পৃথিবীর সবদেশেই কথোপকথনের নামান্তর। কিন্তু তুলসীর মালা হাতে দুটি বুড়ীর ফিস্ফিস্ করে কথা বলার মধ্যে যে হাব-ভাব ও হিউমার প্রকাশ পেয়েছে তা শুধু ভারতীয় নয় একান্তভাবে বাঙালী। এদের দেখেননি বা চেনেন না এমন লোক বাংলা দেশে পাওয়া ভার।

প্রদোষবাবুর কাজের এই আলোচনা থেকে কয়েকটা জিনিস বেশ পরিষ্কার হয়। সত্যিকারের সৃজনী ক্ষমতা ছাড়াও প্রদোষবাবুর শিল্পী হিসেবে বড় বৈশিষ্ট্য হল—মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী, দেখবার চোখ, ও তাঁর সক্রিয়তা। ছোটখাট ঘরকন্নার খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ ক'রে অ্যাব্স্ট্রাক্ট ফর্মের সৌন্দর্য, সবকিছুই তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে। তাঁর কাজের ধারা দেখলে বোঝা যায় যে তিনি সর্বদাই জানবার ও শেখবার চেষ্টা করেছেন এবং নতুন নতুন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এই সক্রিয়তাই প্রদোষবাবুর শিল্পী-জীবনের বড় কথা। তাই তাঁর ভবিষ্যত কাজ দেখবার জন্যেই শিল্পরসিকদের মহলে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়।

চীনদেশের নাচ ও নৃত্যনাট্য

ইন্দ্রাণী রহমান

ভারতীয় সংস্কৃতি দলের সদস্য হিসাবে আমি সম্প্রতি যখন চীন ভ্রমণে গেছিলাম, তখন আমাদের প্রতিবেশী এই সুপ্রাচীন ও মহান দেশটির নৃত্য, গীত ও সঙ্গীতের কিছু নিদর্শন দেখবার সুযোগ পেয়ে সুখী হয়েছিলাম। আমাদের দল চীনদেশের যে তেরটি শহর পরিদর্শন করেছিল তার সবগুলিতেই আমাদের সম্মানে আঞ্চলিক মঞ্চ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ অভিনয় ও নৃত্যকলার আয়োজন হয়েছিল। সুতরাং চীন রঙ্গমঞ্চের বর্ণাঢ্য স্মৃতি নিয়েই আমরা দেশে ফিরে এসেছি।

ভারতে যেমন প্রাচীন নৃত্য-রীতির একটি সুস্পষ্ট ধারা আছে, চীন দেশে সে-রকম কিছু নেই। সেখানে ক্লাসিক নাচ অপেরারই একটি অঙ্গ, যাতে নৃত্য, বাহুভঙ্গীমা, অভিনয়, আবৃত্তি, কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং উল্লম্ফন একত্র মিলিত হয়ে নৃত্য-নাট্যের অবতারণা করে। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে যে অনেক সময় বহুরসের মিলন হত, এর সঙ্গে তার যেন কোথায় মিল আছে। ওই বিশাল দেশের প্রদেশে প্রদেশে এই নৃত্য-নাট্যগুলি বিভিন্ন ভাষায়, ভঙ্গীমায় ও সঙ্গীতে অভিনীত হয় কিন্তু সর্বত্রই সেগুলি প্রাচীন সাহিত্য কিংবা লোকসাহিত্য অবলম্বনে গঠিত হয়েছে। ওখানে যতগুলি নৃত্য-নাট্য আমার ভাল লেগেছিল তার মধ্যে পিকিং অপেরাই শীর্ষস্থান দাবী করতে পারে। সেখানেই আমি বিশ্ববিখ্যাত মেই ল্যাং ফ্যাং-কে মঞ্চে দেখেছি।

পিকিং অপেরার শিল্পীরা বেশীর ভাগই পুরুষ। আমাদের কথাকলি নাচেও তাই এবং এই দুই নৃত্যের শিল্পীদের রূপ-সজ্জা প্রায় একই ধরনের। বীরত্বব্যঞ্জক, দানবীয় এবং হাস্যময় ভাব প্রকাশ করার জন্যে মুখে উজ্জ্বল বর্ণপ্রলেপ দেওয়া হয়। মুখাবয়বে এই ধরনের বর্ণ লেপনের

নারীরবেশে বিশ্ববিখ্যাত চীনা অভিনেতা মেই ল্যাং ফ্যাং।

সঙ্গে আমাদের কথাকলি নর্তকদের মুখোসের ন্যায় মুখাঙ্কনের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। পিকিং অপেরার কয়েকটি চরিত্র এমনি কিম্ভূতকিমাকার যে দেখলে রীতিমত ভয় পেতে হয়। মহিলা-শিল্পীদের রূপসজ্জা কিন্তু সুন্দর এবং নারীত্বভাবসম্পন্ন। কালো রেখার মধ্যে মুখ পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পায়, তাঁদের পরিধানে থাকে কোমল গাউন, মাথায় অপরূপ কেশাবরণ এবং দেহে অজস্র পুষ্পস্তবক আর পুষ্পমাল্য। যোদ্ধার অভিনয়ে পুরুষেরা অবশ্য বিপুলাকৃতি ব্রোকেডের জামা এবং কাঁধের বর্মের উপর সুদীর্ঘ পালক পরেন। দেহের উচ্চতা বাড়াবার জন্য তাঁদের পায়ে থাকে মোটা ভারী জুতো। মুখে থাকে বিচিত্র বর্ণ-ব্যঞ্জনা। অনেকের মুখে লম্বা লম্বা দাড়িও থাকে আবার। পিকিং অপেরাতে সেই সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর হনুমানকেও দেখেছি, যিনি তাঁর জাতি-সুলভ লম্ফ-ঝম্পে সেখানকার স্বর্গ-রাজ্যেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন।

এরপর সুশিক্ষিত মুদ্রার সুচারু বিন্যাসে কাহিনীর পর কাহিনীর মিছিল চলেছে, আর শিষ্ট দর্শকেরা স্থির হয়ে প্রত্যেকটি ভঙ্গীর যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করছেন। কখনও সুরময়, কখনও ছন্দোময় কথাবার্তা। আর সবকিছুকে ঘিরে ঐকতানের মায়াজাল। কোনও কোনও অবস্থায় নাচ অত্যন্ত উত্তেজনাময় হয়ে ওঠে—দেখা যায় দেহের প্রাণময় উৎক্ষেপণ! এখানকার মঞ্চে কিন্তু দৃশ্যপটের ব্যবহার অত্যন্ত কম। তবে, প্রতীক হিসাবে শিল্পীরা কখনো কখনো দৃশ্যের অবতারণা করে থাকেন। পিকিং অপেরার এইরূপ অনেক মুদ্রা এবং নৃত্য-ভঙ্গীর সঙ্গে আমরা আমাদের প্রাচীন নাচের সাদৃশ্য দেখে সত্যিই আনন্দিত হই।

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ও জনৈকা বিখ্যাত চৈনিক মঞ্চশিল্পী।

চীনের আর একটি জনপ্রিয় অপেরা হল সাওসিং অপেরা। তাতে মেয়েরা নাচ দেখায়। এই অপেরার অভিনয়ভঙ্গী কোমল, বিষয়বস্তু আরো কাব্যময়। তাছাড়া এতে মুখে অত রং মাখার ঘটা নেই, আর নেই লাফঝাঁপ। এর সঙ্গীতে সুর-সম্পদ এবং একটি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য আছে। তাছাড়া এতে পিকিং অপেরার চেয়েও বেশী মঞ্চসজ্জা থাকে। সাওসিং অপেরার একটি কাহিনী—দুটি যুবক যুবতীকে নিয়ে, অসময়ে মর্মন্তুদ মৃত্যুর পর যাদের প্রেম সার্থকতা পেল। তখন তাদের দুটি আত্মা হলুদবর্ণ প্রজাপতি যুগলের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল। এই সমগ্র অপেরাটিই চীনের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাতে চীনের প্রাচীন নৃত্য-নাট্য ও অপেরার সমস্ত বর্ণবৈচিত্র্য এবং মোহময় চমৎকারিত্ব বিরাজমান!

চীন দেশে এই অপেরা অথবা নৃত্য-নাট্যের বিপরীত-ধর্মী লোকনৃত্যগুলি কিন্তু আমাদের এ-দেশের লোকনৃত্যের মতই সংখ্যাতীত। সেগুলিতে জীবনের আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। একই প্রদেশের শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে তাদের রূপ বিভিন্ন। বহু নর-নারী এই সব নাচে অংশ গ্রহণ করে। এইসব সরল সুন্দর নাচগুলি আধুনিক রঙ্গমঞ্চে যেভাবে পেশাদারী কুশলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তা' দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। আমরা য়ুনান প্রদেশে 'ফুলের লণ্ঠন' নাচ দেখেছি, উত্তর-পূর্ব চীনে 'প্রজাপতি শিকার' নাচ দেখেছি। হোপাই প্রদেশে দেখলাম—বড় বড় দামামা প্রচণ্ড শব্দে বাজছে, আর পুরুষ শিল্পীরা সিংহের

চৈনিক মঞ্চের একটি দৃশ্যে দু'জন শিল্পী।

ভারতনাট্যম নৃত্যরত শ্রীমতী ইন্দ্রাণী।

মূর্তি ধরে' বহু উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়ে নাচ সুরু করছে। এরপর সিংকিয়াং-এ সংখ্যালঘুদের নাচেও আবার দেখলাম—আমাদেরই মত গ্রীবা-ভঙ্গীমা!

আমরা চীন দেশের সর্বত্রই, প্রায়শঃ সমস্ত শহরগুলিতেই বহু সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ নজর করেছি, সে গুলির প্রত্যেকটিতেই কয়েক হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হয়। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা যতগুলি নৃত্যাভিনয় চীনে দেখেছি, তার সবগুলির আয়োজন করেছিল কিন্তু স্থানীয় দলেরাই। আশ্চর্যের বিষয় এই জন্যে যে, সর্বত্রই এমনকি সিংকিয়াং-এর মত অনুন্নত স্থানেও, এই সব নৃত্যাভিনয়ে মঞ্চের আঙ্গিক, নৃত্যের মান এবং পেশাদারী জাঁক জমকের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছিল।

সম্প্রতি সরকারী পরিকল্পনায় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চীনের প্রাচীন ও লোক শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সরকারী বৃহৎ নৃত্যানুষ্ঠান এবং সরকারী নৃত্য সংসদের সাহায্যে মুমূর্ষু প্রাচীন নৃত্য ও লোকনৃত্যগুলির পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। এই সব অনুষ্ঠানগুলির আয়োজনের ভার চীন মন্ত্রীসভার কৃষ্টিদপ্তরের উপর। এখন সর্বসমেত সাঁইত্রিশটি সরকারী নৃত্য সংসদ আছে, তার মধ্যে সিংকিয়াং, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের সংখ্যালঘুদের জন্যই চৌদ্দটি। যে সব লোকনৃত্য আজও টিঁকে আছে সেগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করবার এবং সেগুলিকে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহগুলির মঞ্চানুযায়ী করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবার দায়িত্ব এই সব সংসদের। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলিতেও অসংখ্য স্থানীয় দল আছে। মস্কোর বলশয় থিয়েটারের কোরিওগ্রাফিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকরণে পিকিং-এও একটি নৃত্য অ্যাকাডেমি স্থাপিত হয়েছে। সেখানে চীনদেশের নাচের উপর গভীর গবেষণা চলে এবং চীনের প্রধান নৃত্য শিল্পীরা নবীন শিক্ষার্থীদের চীনদেশের প্রাচীন নৃত্য, লোকনৃত্য এবং ইউরোপীয় ধরনের ব্যালে নৃত্য শেখান। নৃত্য সম্পর্কে নূতন সৃষ্টি এবং পরিকল্পনাও করেন এই প্রতিষ্ঠান।

এরপর, নব জাগ্রত এশিয়ার প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তাল রেখে মহাচীন যে তার নৃত্য-কলাকে ক্রমোৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার পথে সুনিশ্চিত এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে কী?

কবির্মনীষী পরিভুঃ স্বয়ম্ভুঃ

দিনেশ দাস

একটি মুহূর্ত শুধু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার
অনন্ত বিশাল এক প্রাণের প্রবাহ
কালহীন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের সম্ভার
অখণ্ড জীবন-মৃত্যু নদী-হিমবাহ।

মৃত্যু শুধু রক্তজবা-কুসুমসঙ্কাশ
সূর্যোদয়—চেতনার অন্য এক স্তর :
সহসা আবিষ্কৃত আর এক আকাশ
আরো এক প্রাণস্পন্দ প্রাণের ভিতর।

ভবিষ্যৎ-বর্তমান অতীতের তীরে
নৃসিংহ বরাহ কূর্ম মীন অবতার
পার হ'য়ে : সৌর লোকে আলোকে-তিমিরে
অদৃশ্য স্ফটিক আলো লীলার বিস্তার।

সেই নিত্যলীলা চলে অন্তরঙ্গ মনে,
কবির ব্রহ্মাণ্ড জাগে কোনো ব্রাহ্মক্ষণে ॥

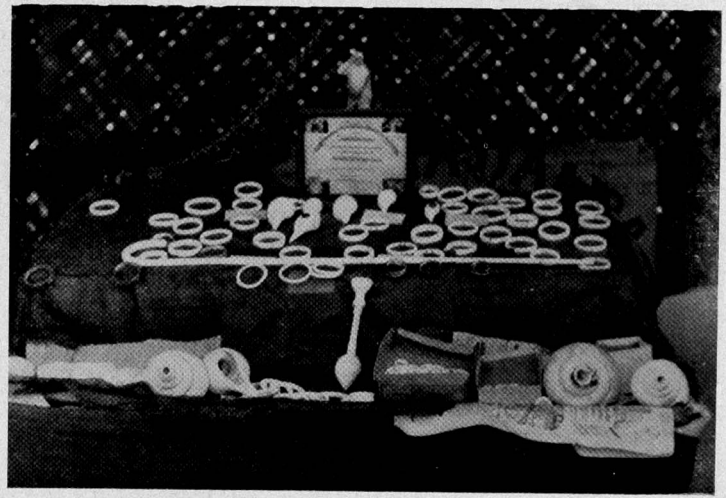

শাঁখের তৈরী নানাবিধ সুন্দর জিনিসের নমুনা।

বাংলার শঙ্খশিল্প

বিশ্বনাথ চৌধুরী

বাঙালীর জীবনে কল্যাণ ও শুভেচ্ছার প্রতীক শঙ্খ, যা কিছু মঙ্গল ঘোষণা শঙ্খ ধ্বনির সাহায্যেই-হ'য়ে থাকে। দেব-দেবীর পূজা, পালপার্বন, বিবাহ, যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে শঙ্খ-ধ্বনি একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে শুধু নয়—তারও পূর্বে এই রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে এ-বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে পাঞ্চজন্যের উল্লেখ তেরশ' তেষট্টি ॥

সর্বজন বিদিত। শাঁখের অলঙ্কার ব্যবহার একটি অতি প্রাচীন প্রথা।

বাঙালী মেয়েরা ধর্ম আচরণের মতই এই প্রথাকে স্বীকার কোরে, পালন করে আসছেন।

প্রাচীন কালে এই শাঁখের অলঙ্কার শুধু-বঙ্গদেশেই প্রচলিত ছিল না, দক্ষিণ ভারতে টিনেভেলি থেকে তার উত্তর পশ্চিমে কাথিবাড় এবং গুজরাট পর্যন্ত এর ব্যবহার

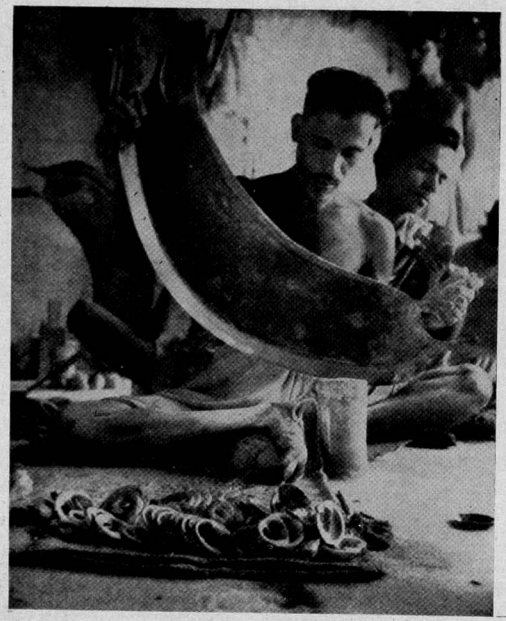

শাঁখের করাত হাতে কার্যরত শাঁখারী।

ছিল। কাথিবাড় এবং গুজরাটে শঙ্খশিল্প বহুদিন থেকেই ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে রামনদ উপকূলে কিছু কিছু শঙ্খের কাজ হয়। শুধু বঙ্গদেশ এবং আসামে এখনও এর বিস্তৃতি এবং প্রাধান্য লোপ পায় নি।

শঙ্খশিল্পের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য নিয়ে ঢাকার শিল্পীরা একদিন দিগ্বিজয় করেছিল। সপ্তদশ শতকে টাভার্নিয়ে ঢাকার শঙ্খ শিল্পের জয়গান করে গেছেন।

প্রাচীনকালে শঙ্খশিল্প শুধু বাংলার নয় ভারতেরও গৌরব ছিল। অবিভক্ত বাংলায় যে সব শিল্প উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথ খুঁজে পেয়েছিল—দেশ বিভাগের ফলে তা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একমাত্র শঙ্খ শিল্পের ভবিষ্যত যে কি পরিমাণ বাধাগ্রস্ত এবং ব্যাহত হ'য়েছে, তা বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই আপাতত ভালভাবে বোঝা যাবে।

দেশ বিভাগের আগে শঙ্খশিল্পীর সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার চারশ। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ঢাকায় বাস করতেন।

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পর, পূর্ববঙ্গ থেকে সাড়ে সাত হাজার (আনুমানিক) শঙ্খবণিক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রায়

প্রত্যেক জায়গায় তাঁরা পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন—এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় চার হাজার পাঁচ'শ শঙ্খশিল্পী বাস করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্বে থেকেই যে সব শাঁখারীরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার সুতরাং বিভক্ত পশ্চিম বাংলায় এখন শঙ্খ বণিকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে বার হাজার।

কাঁচা মাল সরবরাহ ব্যাপার শঙ্খ শিল্পের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশ বিভাগের আগে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ লক্ষ শঙ্খ আমদানী হ'তো—বেশীর ভাগই হ'তো সিংহল থেকে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ-এর পর সিংহল থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতের টিউটিকোরিন, রামনদ, ত্রিবাঙ্কুর থেকে যা আমদানী হয় তা চাহিদার পক্ষে খুবই কম।

বর্তমান চাহিদার আনুমানিক হিসাব নিলে দেখা যাবে সাড়ে বার হাজার শঙ্খজীবীর জন্যে অন্ততঃপক্ষে সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শঙ্খের প্রয়োজন। সারা ভারতে বৎসরে ১৭।১৮ লক্ষের বেশী শঙ্খ মেলে না। সুতরাং কাঁচামালের অভাব চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, তাই শঙ্খের দামও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সব ব্যবসায়ে যা এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। যাদের টাকা আছে তারা মুনাফার আশায় মাল মজুত করছেন এবং চড়া দামে মাল বিক্রি করছেন।

দেশবিভাগের ফলে শঙ্খ শিল্পীরা একেই নানাদিক থেকে বিপর্যস্ত সম্পদহীন তার ওপর কাঁচামালের ক্রম-বর্ধমান মূল্যস্ফীতিতে শঙ্খ শিল্পের চরম সংকট উপস্থিত। —অনেকে অর্থের অভাবে সুখদুঃখের স্মৃতি বিজড়িত পূর্বপুরুষের জাত ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে শঙ্খ শিল্পকে মুক্ত করার জন্যে—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবিভাগ অগ্রসর

অজস্র শাঁখের স্তূপ। এর থেকে বাছাই করার পর ভাল শাঁখ দিয়ে তৈরী হয় নানরকম জিনিস।

হয়েছেন। মাদ্রাজ সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থার ফলে উচিৎ মূল্যে টিউটিকোরিন থেকে কাঁচামাল আমদানীর পথ প্রশস্ত হ'য়েছে।

ভারত সরকারের সহযোগিতায় এখন সিংহল থেকেও কাঁচামাল আনাবার সুবন্দোবস্ত হ'য়েছে।

এই কাঁচামাল বণ্টনের ব্যবস্থা সমবায় সমিতির সাহায্যে করা হ'চ্ছে—ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর শঙ্খজীবী যাতে প্রয়োজনমত কাঁচামাল পায়, সমিতিকে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে নির্দেশ দেওয়া আছে।

এই প্রবন্ধে পরিবেশিত চিত্র থেকে দেখা যাবে শাঁখ থেকে কত রকমের জিনিস তৈরী হয়—বালা, চুড়ি, আংটি, কৌটা, মালা প্রভৃতি বহু জিনিসই শিল্প নৈপুণ্যের জন্যে লোকের সমাদর লাভ করছে।

এইসব জিনিস সম্পূর্ণ ও নিখুঁতভাবে তৈরী করতে যে কত পরিশ্রম করতে হয় তার খোঁজ হয়ত অনেকেই রাখেন না।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাঁখার ব্যবহার শুধু বাংলায় কেন ভারতের নানা অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। অলঙ্কার হিসেবে বাঙালী মেয়েদের কাছে এর সমাদর সবচেয়ে বেশী—এয়োতির চিহ্ন বলেই শাঁখা কল্যাণ এবং শুভকামনায় শুভ্র এবং পবিত্র হ'য়ে উঠেছে'—মেয়েরাও শাঁখার অলঙ্কার ভালবাসে—হিন্দুর বিয়ে শাঁখা ছাড়া হ'বার বিধি নেই।

এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে শাঁখার চাহিদা কত বেশী।

ন'টি অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে একটি সুন্দর মসৃণ শাঁখা তৈরী হয়।

প্রথম অবস্থা—শাঁখের আঁশ তুলে শাঁখ ভাঙ্তে হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা—শাঁখের চারিপাশ মসৃণ করে কাটতে হয়,

তৃতীয় অবস্থা—শঙ্খের ভিতর ছিদ্র করা হয়।

চতুর্থ অবস্থা—শাঁখকে গোল করে কাটা।

পঞ্চম অবস্থা—গোলকরে কাটার পর দু'দিক শিলায় ঘষে সমান করতে হয়।

ষষ্ঠ অবস্থা—গোলকরে কাটার পর শাঁখের করাত দিয়ে কেটে শাঁখা তৈরী করা।

সপ্তম অবস্থা—শাঁখার ওপর নানা রকম সূক্ষ্ম হাতের কাজ এবং ডিজাইন করা।

অষ্টম অবস্থা—নাইট্রিক এসিড দিয়ে পালিশ করা।

নবম অবস্থা—কোন রকম ত্রুটি থাকলে তা পরীক্ষা করে ঠিক করে দেওয়া।

শাঁখ কাটার কাজই সবচেয়ে পরিশ্রমের এবং কষ্টের ব্যাপার। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত চিত্র থেকে দেখা যাবে কি অসম্ভব পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে শঙ্খ শিল্পী তার কাজ করে যাচ্ছেন।

এই হাতে কাটার শ্রমসাধ্য ব্যাপার থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র যন্ত্র। এবং এই রকম শঙ্খ কাটার যন্ত্রের উদ্ভাবনও হয়েছে।

কিন্তু শঙ্খ শিল্পীরা তা গ্রহণ করতে নারাজ। তাঁদের আশঙ্কা যন্ত্রের প্রচলন হলে অনেক শিল্পীই বেকার হয়ে যাবে। তাদের এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আদতে যন্ত্রের সাহায্যে লোকে অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে বেশী পরিমান শাঁখ কাটতে পারবে।

বেশী পরিমান শাঁখ কাটা মানে—শাঁখের বিভিন্ন অবস্থার কাজ বেড়ে যাওয়া—সুতরাং করিগরদের বিভিন্ন অবস্থার কাজের জন্যে সব সময়ই আবশ্যক হ'বে, তারা কেউই বেকার অবস্থায় বসে থাকবে না। প্রচুর কাঁচামালের কাটতি হবে। তৈরী জিনিসের দামও কমে যাবে। লোকে সস্তায় ঘরে ঘরে শাঁখের জিনিষ ব্যবহার করতে পারবে।

দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খের তৈরী নানা জিনিসের সমাদর বৃদ্ধি পাবে এবং শঙ্খশিল্প প্রসারের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করবে।

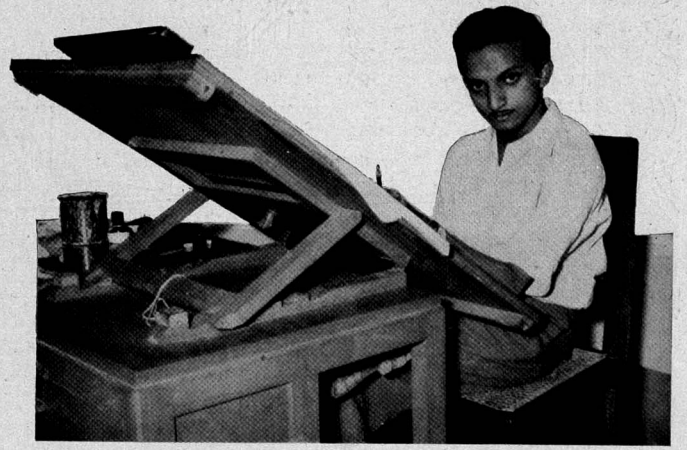

প্রচারশিল্পী রনেনআয়ন দত্ত

রঘুনাথ গোস্বামী

কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের একটি ছোট্ট আলো-বাতাসহীন ঘরে বসে একটি ছোট্ট ছেলে নিবিষ্ট মনে একটি ঘড়িকে খুলে ফেলে তার ভিতরের রহস্যময় কলকব্জাগুলি নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখত। ঘড়ির প্রাণকেন্দ্রে খোঁচা মেরে মেরে তার অসংখ্য ছোটবড় দাঁতওয়ালা চাকাগুলোর নড়াচড়া মুগ্ধ বিস্ময়ে ছেলেটি দেখতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। উত্তর জীবনে এ ছেলের হয়ত একজন বিজ্ঞানী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তা না-হয়ে ছেলেটি হয়ে উঠল একজন শিল্পী। আমি শিল্পী রনেনআয়ন দত্তের কথা বলছি।

আধুনিককালের তরুণ কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের মধ্যে রনেনআয়ন দত্ত একজন কুশলী এবং যশস্বী শিল্পী। এঁর জন্ম শ্রীহট্টের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। এঁর পিতা শ্রীরজনীমোহন আয়ন দত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কর্মী ছিলেন। ইংরাজীতে প্রডিজি বলতে যা বোঝায় রনেনআয়ন ছোটবেলায় সে অর্থে প্রডিজি ছিলেন না। ঝাঁটার কাটির উপর মাটি লাগিয়ে দুর্গাঠাকুর বা দু-চারটি 'দেবদেবীর' মূর্তি (?) গড়া এবং আরও দু-চারটে টুকটাক হাতের কাজ ছাড়া ছোটবেলায় তাঁর মধ্যে অসামান্য কোন শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। হাতের কাজ ছাড়া কিছু কিছু ছবিও আঁকতেন। আর্ট স্কুলে ঢোকার আগে পর্যন্ত ছবি আঁকার কাজে একমাত্র পেনসিল আর খাতার কাগজই ছিল তাঁর সম্বল। কারণ নিদারুণ দারিদ্রের জন্য ছবি আঁকার সরঞ্জাম কেনবার তাঁর সাধ্য ছিল না। কৈশোরে পিতা রজনীমোহন দত্তই ছিলেন ছবি আঁকার ব্যাপারে একমাত্র উৎসাহদাতা। তাঁর সঙ্কল্প ছিল ছেলেকে ম্যাট্রিক পাস করিয়েই আর্ট স্কুলে পাঠাবেন।

রনেনআয়ন দত্ত অঙ্কিত একটি বিজ্ঞাপন

কমার্শিয়াল আর্টিস্ট রনেনআয়ন দত্তের সাফল্যের কারণ পর্যালোচনা করতে গেলে তার পটভূমিকার কথাও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। উত্তরকালে কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে যশোলাভের পিছনে রয়েছে রনেনআয়ন দত্তের ফাইন আর্ট শিক্ষার কঠোর অধ্যবসায়ের ইতিহাস।

ম্যাট্রিক পাস করার পর রনেন দত্ত আর্টস্কুলে প্রবেশ করেন। আর্টস্কুলে ঢোকা তাঁর নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা বিরাট আলোড়ন। পূর্বাচার্যদের শিল্পকর্মের অসংখ্য প্রতি-লিপি, দক্ষ কলাবিদ শিক্ষককুল, নানা মিডিয়মের প্রকারভেদ, হাজার রকমের করণ কৌশল আর শিল্পশিক্ষালয়ের সৃজনধর্মী বাতাবরণ তাঁর জীবনে সমুদ্রের স্বাদ এনে দিল। ঝামাপুকুরের আলোবাতাসহীন অন্ধগুহায় সেই ছেলেটির মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা এতদিন বন্দী হয়ে ছিল শিল্পশিক্ষার এই আয়োজনের মাঝখানে এসে তা মুক্তি পেল। শিল্পী-জীবনের সুরু থেকেই তাঁর কাজের মধ্যে এই মুক্তির একটা বিরাট উল্লাস দেখতে পাওয়া যায় এবং সম্ভবতঃ এই উল্লাসই তাঁর ছবিগুলিকে জীবনধর্মী করে তুলেছে। আমার ধারণা এই জীবনধর্মই তাঁর শিল্পকর্মগুলিকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে ও পেশাদার শিল্পশিক্ষার্থীদের কাজের ইমোশান-হীন বিবর্ণতা থেকে পৃথক করে রেখেছে।

প্রথমবর্ষ থেকে তৃতীয়বর্ষ পর্যন্ত আর্টস্কুলের এলিমেণ্টারী ক্লাশ। এই তিন বৎসর আর্টস্কুলে নবীন শিক্ষার্থীদের যে ব্ল্যাক বোর্ড ড্রইং, কপি, একটু-আধটু গাছের ফুলপাতা আঁকা আর পারস্পেকটিভ বিদ্যা মক্স করানো হয়ে থাকে তাতে রনেন আয়ন দত্তের মন ভরতো না। ছবি আঁকতে হবে। আর্টস্কুলের ছেলেদের মধ্যে তখন (অবশ্য এখনও তাই) বাইরে গিয়ে ছবি এঁকে আনার দারুণ হিড়িক। তরুণ শিক্ষার্থী রনেনও অপরের দেখাদেখি কলকাতার বাইরে গিয়ে ছবি এঁকে আনার জন্য মনে মনে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু অর্থ কই? কঠোর দারিদ্র। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে আর্টস্কুল যেতে ছ'পয়সা আর খেতে ছ'পয়সা। বাড়ি থেকে সাকুল্যে দু'আনা পয়সা তাঁর রোজকার বরাদ্দ। কলকাতার বাইরে যাওয়া দূরের কথা রং-তুলি কেনবারও পয়সা নেই। তাই বলে কি ছবি আঁকা বন্ধ থাকবে! না হয়, না-আঁকা গেল পুরীর সমুদ্র, হিমালয়ের তুষার মহিমা বা ব্রহ্মপুত্রের দিগন্ত-বিস্তৃত চর। কিন্তু ছবি তো আঁকতেই হবে। ক্ষেত্র স্থির হল কলেজ স্ট্রীট আর মেছোবাজার। কারণ সেটাই সবচেয়ে হাতের কাছে। এছাড়া মানিকতলার খালধার তো আছেই! সেখানে জলচর মানুষজন, পানসি, নৌকো আর মালবহা ভড়গুলোর মাঝে যেন রয়েছে একটুখানি সুদূরের আহ্বান। মেছোবাজারের অন্ধগলির বিবর্ণ বাড়িগুলোর উপর যখন বিকেলের রোদ এসে পড়ে তখন সেগুলোই লাভ করে অনির্বচনীয়তা। শিল্পীর চোখে ধরা দেয় সেই অনির্বচনীয়তা। কলেজ স্ট্রীটের যানবাহন আর মনুষ্য সঙ্কুল রাস্তার মোড়, বাড়ির ছাদ আর কাটাকানিশে পায়রার বাসা, মন্থর দুপুরে মেছোবাজারের রাস্তার সিমেণ্ট বাঁধান বটগাছটার তলায় সিঁদুর মাখান হনুমানজীর মূর্তি আর পাশে ঠায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা ছ্যাকড়া গাড়ির ঝিমন্ত কঙ্কালসার ঘোড়াগুলো এ সবকিছু বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিল

এই তরুণশিল্পীর কাছে। শহরের আবর্জনাভরা, পঙ্কিল মানিকতলার খালধার থেকে আরম্ভ করে বাড়ির আশে-পাশে অনেক কিছুকে তিনি ধরে রাখলেন অসংখ্য ওয়াটার-কলার স্কেচের মধ্যে। তুচ্ছ সামান্য বিষয়বস্তুগুলো অসামান্য হয়ে বেঁচে রইল অগণিত চিত্রকর্মের মধ্যে। তিনি এই সময় দেবসাহিত্য কুটীরের কতকগুলি বই-এর স্পাইন আঁকার অর্ডার পান। প্রত্যেকটি স্পাইনের জন্য পারিশ্রমিক পেতেন এক টাকা থেকে দেড় টাকা। এই কাজ করে চল্লিশটি টাকা জমিয়ে রনেনআয়ন দত্ত বেনারস চলে যান ছবি আঁকবার জন্য। শিল্পীর জীবনে এই প্রথম ছবি আকবার জন্য 'বিদেশযাত্রা' তখন তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বেনারসে গিয়ে এক মাসে তিনি একশো পঁচিশ খানি ছবি আঁকেন। আর্টস্কুলের প্রদর্শনীতে সেই বৎসরই তাঁর বাইশ খানি ছবি বিক্রি হয়। একটি প্রদর্শনীতে একজন শিল্পীর এতগুলি ছবি বিক্রি একটা রেকর্ড সৃষ্টি করে।

আর্টস্কুলে মাস্টার—মশাইদের মধ্যে আনোয়ারুল হক তাঁকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেন। বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন (তখনকার শিক্ষক) তাঁকে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগান। উত্তর জীবনে রনেনবাবুর কাজের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এছাড়া ছাত্রজীবনে, প্রখ্যাত শিল্পী রমেন চক্রবর্তী ও অতুল বসুর এবং আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, কানোয়ালকৃষ্ণ, মুরলীধর টালি, দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা তাঁকে প্রভাবিত করেন। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে মুরহেড বর্ন, সুইস্লার, ব্রাংগুইন, টার্ণার প্রভৃতি শিল্পীর প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছে।

আর্টস্কুলের প্রথম বার্ষিক ছাত্র অবস্থায় তিনি আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রী প্রদর্শনীতে শাড়ির পাড়ের নক্সা এঁকে এক হাজার টাকা বৃত্তি পান। পরের বছর আন্তঃ-এশিয়া শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পান। ঐ বছরই তিনি 'ভবানী লাহা স্বর্ণপদক' পান। এছাড়া ছাত্রজীবনের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছেন।

ফাইন আর্টের ছাত্র হিসাবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ওয়াটারকলারিস্ট এবং তাঁর কাজের মধ্যে ল্যাণ্ডস্কেপই বেশী। কিন্তু একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্টদের মত ফিগার ড্রইং-এ তিনি দুর্বল নন। ফিগার স্টাডি বা কম্পোজিশনেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। অঙ্কন প্রথায় জাতিগত দিক থেকে দেখতে গেলে রনেনবাবু একজন রিয়ালিস্ট। যদিও নেচার যান্ত্রিক অনুকৃতি তাঁর উপজীব্য নয়। কথাটা আরও ব্যাখ্যা করতে গেলে কুমার-স্বামীর দেওয়া সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রিয়েলিজম্' কুমারস্বামী বলেছেন, 'যেখানে অভাব বোধ থাকে না।' অর্থাৎ আর্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, চিত্রে এবং চিত্রবস্তুতে মিল না থাকলেও যখন অভাব বোধ হয় না। ফাইন আর্টের ছাত্র হিসাবে রনেনবাবু মনে করেন যে নেচারের পুনর্বিন্যাস করবার এবং নিজের মনের রং মেশাবার অধিকার শিল্পীর আছে। এছাড়া প্রত্যেক শিল্পীর দায়িত্ব হল চিত্রবস্তুর

একটি বিজ্ঞাপনের খসড়া।

Pg 58

রনেনআয়ন দত্ত অঙ্কিত কয়েকখানি বিজ্ঞাপন।—

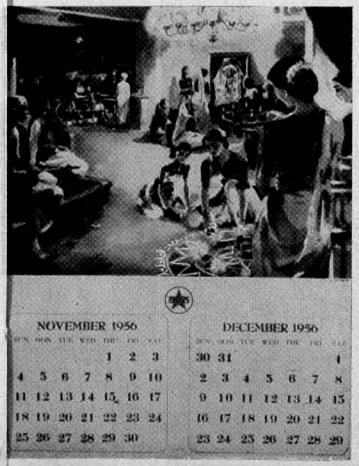

59

বহুবর্ণে ছাপা একটি ফোল্ডার।

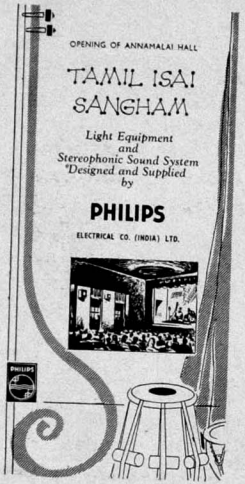

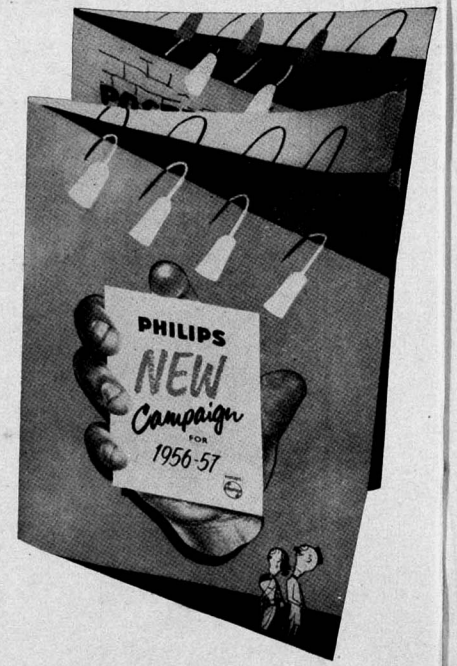

दुई रङ्गे छापा एकथानि क्यालेण्डर ।

अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने।
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं॥

अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधुता से जीते, कंजूस को दान से जीते, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते।

टाटा स्टील

टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड

বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর গুণগত দিকটিকেও আবিষ্কার করা।

রনেনআয়ন দত্ত তাঁর আর্টস্কুল জীবনের শেষের দিকে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুনসীর সংস্পর্শে এসে কমার্শিয়াল আর্টে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীঅন্নদা মুনসীর নিজস্ব স্টুডিয়ো 'প্রকাশিকা'তে তিনি কিছুদিন কাজ করেন। শ্রীযুক্ত মুনসীর সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাময় ঘটনা। এড্-ভারটাইজিং আর্টে শ্রীযুক্ত অন্নদা মুনসী মহাশয়ই তাঁর শিক্ষাগুরু। ফাইন আর্টের ছাত্র রনেনআয়ন দত্ত কমার্শিয়াল আর্টের জগতে প্রবেশ করেন কিছুটা অনুকম্পা মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে, একজন আগন্তুক হিসাবে। কিন্তু অন্নদা মুনসীর মত অসাধারণ প্রতিভাশালী আর্টিস্টের সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমশঃ উপলব্ধি করেন যে, শিল্পের এই ফলিত বিভাগটিতেও করবার এমন অনেক কিছুই আছে যা বিশুদ্ধ আর্টের চর্চা করার মতই চিত্তাকর্ষক। আর্টস্কুল থেকে বেরিয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত পাবলিসিটি ফোরামে চিফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন এবং কমার্শিয়াল আর্টকে জীবিকা রূপ গ্রহণ করেন। এখানে কিছুদিন কাজ করার পর উনিশো একান্ন সালে বোম্বাই-এর স্টনাক্ এডভারটাইজিং-এ ভিস্থয়ালাইজার এবং ফিগার আর্টিস্ট হিসাবে যোগ দেন। পরে এই প্রতিষ্ঠান তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসে আর্ট ডাইরেক্টর করে। বর্তমানে শ্রীযুক্ত দত্ত জে. ওয়াল্টার টমসনে একজন অন্যতম আর্ট ডাইরেক্টর।

রনেনআয়ন দত্ত ফাইন আর্টের ছাত্র হিসেবে যা যা শিখেছেন, তা তাঁর জীবনে অফলা হয়ে যায় নি। ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হিসেবে আইডিয়ার দিক দিয়ে তিনি যেমন উর্বর তেমনি তাঁকে রঙে রেখায় যথাযথভাবে প্রকাশ করার কাজেও তেমনি কুশলী। এই দুটি গুণের সমন্বয় আমাদের দেশের কমার্শিয়াল আর্টের জগতে একটি বিরল ঘটনা। এদেশের মুষ্টিমেয় ফিগার আর্টিস্টদের মধ্যে তিনি এখন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এছাড়া ইলাস্ট্রেশনের কাজে তাঁর অসাধারণ মুনসীয়ানা দেখে মনে হয় যে তিনি যদি শুধু ইলাস্ট্রেশনের কাজেই আত্মনিয়োগ করতেন, তা হলে হয়ত আমাদের দেশ একজন সত্যকার ভাল ইলাস্ট্রেশন আর্টিস্ট পেত। শ্রীযুক্ত রনেনআয়ন দত্ত প্রথমে আর্টিস্ট তারপর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। তাঁর ফাইন আর্টের শিক্ষা তাঁর কমার্শিয়াল কাজে সুষ্ঠ নন্দনীয়তা (এস্থেটিক্ ভ্যালু) এনে দিয়েছে। তাঁর এডভারটাইজিং আর্টের কাজের মধ্যে রয়েছে ফাইন আর্ট আর কমার্শিয়াল আর্টের একটি সুস্থ চুক্তি এবং এইটিই বোধ হয় শ্রীযুক্ত দত্তের কাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

উনত্রিশ বৎসরের তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত দত্ত বিবাহিত এবং গার্হস্থ্যজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা তার উত্তরোত্তর শ্রী ও যশোবৃদ্ধি কামনা করি।

হরলিক্সের জন্য অঙ্কিত একটি বিজ্ঞাপন।

এস্. এস্. বেরম্যান রচিত জীবনালেখ্যে অনুসরণে। পল্ স্টাইনবার্ক চিত্রিত করেছেন। বাম দিকের রেখাচিত্রটি স্টাইনবার্কের দ্বারা অঙ্কিত লর্ড ডুভিনের প্রতিকৃতি।

ডুভিন

আশু চট্টোপাধ্যায়

ইংরিজী আর্টডিলার শব্দের সঠিক বাংলা শব্দ না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ কলার নিদর্শন নিয়ে কারবার করার কারবারী পূর্বে এদেশে তো ছিলই না, এখনও বম্বে দিল্লী কোলকাতায় কয়েকজন হয়তো থাকলেও থাকতে পারেন কিন্তু তাঁরা নামে মাত্র আর্ট ডিলার।

তেমন কোন আর্টডিলারের পাত্তা এদেশে না পাওয়া গেলেও, আদতে ইয়োরোপে এমেরিকায় তাঁদের খ্যাতি আর প্রতিপত্তির তুলনা হয় না। ওসব দেশে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের চেয়ে বেশী উত্তেজনাময় ও রোমাঞ্চকর। আর এখানে এখন যে ব্যক্তিটির কথা বলা হচ্ছে তিনি তো ছিলেন সেই সব খালিফাদের মধ্যে বলতে গেলে একরকম হারুণ-অল্-রসিদের মত সিংহাসন দখল কোরে। অজস্র অর্থব্যয়ে তিনি যে সব ছবি ও শিল্পকলার নিদর্শন তথা আর্ট অবজেক্ট কিনেছিলেন তাতে লণ্ডন প্যারী আর নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর নিজস্ব একটি কোরে বিরাট আর্ট গ্যালারী গড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল। এই জোশেপ ডুভিন যখন একদেশ থেকে অন্যদেশে যেতেন তখন সেই শিল্প সংগ্রহের যৎসামান্য অংশ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেও আদতে অনন্য-সাধারণ নিজের ব্যক্তিত্বই ছিল তাঁর আসল মূলধন। এই ব্যক্তিত্বের জোরেই তিনি আর্টের বাজারকে উত্তাপিত কোরে রাখতেন। তাই যেদেশে যখন তিনি অনুপস্থিত থাকতেন তখন সেখানকার শিল্পসম্ভার ক্রয়-বিক্রয়ের জগতে নেমে আসতো আলস্যের আবহাওয়া, কিন্তু তাঁর

তেরশ' ছেষট্টি ॥

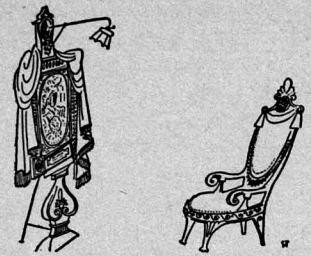

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতো আবার নতুন প্রাণস্পন্দন। উৎসাহের জীবন্ত উত্তেজনায় পুনরায় নবজীবন লাভ কোরতো সে বাণিজ্য।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন চিরদিনের জন্য চোখ বুজলেন তখন তিনি মিলব্যাঙ্কের লর্ড ডুভিন। জীবনের গোড়ার দিকেই তিনি একটি অবধারিত সত্য আবিষ্কার করেছিলেন যে ইউরোপের আছে প্রচুর শিল্পসম্ভার এবং অ্যামেরিকার আছে অপরিমিত অর্থানুকূল্য। তাই সতেরো বছর বয়েস থেকেই তাঁর কাজ হয়েছিল ইউরোপে আর্ট-এর জিনিস সংগ্রহ এবং অ্যামেরিকায় গিয়ে সেগুলি বিক্রি করা। জীবনের শেষের দিকে তাঁর বাৎসরিক কার্যক্রম এক প্রকার বাঁধাধরা ছক-এ পড়ে গেছিল। মে মাসের শেষের দিকে তিনি নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে আসতেন এবং সেখানে জুন আর জুলাই মাস কাটাতেন। তারপর দু'এক সপ্তাহের জন্য প্যারি শহরে আসতেন, সেখান থেকে সপ্তাহ-তিনেকের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে যেতেন স্বাস্থ্যের সন্ধানে। প্যারীতে ফিরেই লণ্ডনে যেতেন। সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে নিউইয়র্কের দিকে যাত্রা করতেন এবং গোটা শীতকাল ও বসন্তের অধিকাংশই কাটত সেখানে।

অবশ্য গণ্যমান্য কোনো কোনো লক্ষপতি খরিদ্দারদের জন্য ডুভিনের এই সুপরিচিত কার্য-সূচির মাঝেমাঝে ব্যতিক্রম যে ঘটত না—তা নয়। অ্যান্‌ড্রু মেলন বা জুলে বাক-এর মত আর্ট-সংগ্রাহকদের সহায়তা করবার জন্যে এক একটি দেশে তাঁকে আরো কিছুদিন মাঝে মাঝে আটকে যেতে হত। কারণ তাঁর অগনিত ভক্ত মণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন আর্ট সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, যদিও তাঁর নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞরা তাঁর আর্টের জ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ পোষন করতেন।

চিত্র কিম্বা বিচিত্র শিল্প সংগ্রহ ইত্যাদি কেনা ছাড়াও অন্য অনেক দিক দিয়েই ডুভিন তাঁর ধনী মক্কেলদের সাহায্য করতেন। তাঁর লণ্ডন এবং প্যারীর গ্যালারীতে সিগার জমা রাখবার অনুমতি তিনি বাক্-কে দিয়েছিলেন। একবার বাক্ যখন প্যারী থেকে আমেরিকার জাহাজ ধরতে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে অ্যাটল্যান্টিক পাড়ি দেবার মত উপযুক্ত সংখ্যায় সিগার তাঁর সঙ্গে নেই। তৎক্ষণাৎ ছুটলেন ডুভিনের আস্তানায়। ডুভিন তখন প্যারীতে ছিলেন না। ডুভিনের প্রধান সহকারী বার্ট্রাম বোগিস্—বাক্‌কে অভ্যর্থনা করে বসালেন এবং সিগার বের ক'রে আনবার ফাঁকে ভ্যান্‌ডাইকের আঁকা একটি ছবি তাঁকে দেখালেন, যেটি ডুভিন নাকি বাক্-এর জন্যই বিশেষ ভাবে বাছাই করে রেখে গেছেন। ছবি দেখে বাক্ এতদূর মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে সিগারের কথা ভুলে গিয়ে ছবিটি তখনই কিনে ফেললেন। এর কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তিনি সিগার এবং ছবি দুই নিয়েই স্টেসনের দিকে যাত্রা করেছিলেন। সিগার জমা রাখবার জন্য তাঁকে কোনো ভাড়া দিতে হত না সত্যি, কিন্তু ভ্যান ডাইকের ছবিটি কিনতে তাঁকে পৌনে তিনলক্ষ ডলার দিতে হয়েছিল। এই উপযুক্ত সাকরেদ বার্ট্রাম বোগিশ পরে ডুভিনের অংশীদার হয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে কোনো ব্যবসায়ীই বোধহয় চার ফেলার কৌশল এমন নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করে উঠতে পারেন নি। এমন কোনো কাজ ছিল না যা ডুভিন তাঁর বিশেষ মক্কেলের জন্য করতে নারাজ ছিলেন। ধনী অ্যামেরিকানরা ইউরোপে এসে টাকা নষ্ট হবার ভয়ে যার-তার সঙ্গে মেলামেশা করতে নার্ভাস হতেন, যেখানে-সেখানে যেতে তো চাইতেনই না! অবিশ্যি বনেদী পরিবারের সম্ভ্রান্ত প্রাসাদে তাঁদের প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা ডুভিনই করে' দিতেন। এই সুযোগে এই সব নিঃস্বপ্রায় অভিজাতদের কিছু কিছু পৈত্রিক আমলের শিল্প নিদর্শন অথবা ছবিও এই সব ধনী অ্যামেরিকানদের কাছে বিক্রি হয়ে যেত। দর-দস্তুর ও লেন-দেনটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডুভিনের মারফত-ই হত।

হোটেলে বা জাহাজে স্থান না থাকলেও ডুভিন তাঁর মক্কেলদের জন্য ব্যবস্থা একটা করতেনই। এমন কি লোক লাগিয়ে তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত তিনি তৈরী করে' দিয়েছেন। তবে, একথা ঠিক যে সেই সব বাড়িতে ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী হত যে, দেওয়ালে ছবি টাঙাবার এবং শিল্প নিদর্শন রাখবার প্রচুর স্থান থাকত এবং সেইসব ছবি আর শিল্প নিদর্শন শেষ অবধি ডুভিনকেই এনে দিতে হত। ধনী খরিদ্দারদের বিয়ের যোগাযোগও ডুভিন করে' দিয়েছেন এবং বিবাহ-সভায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে নব-দম্পতিকে দামী ছবি উপহার দিয়েছেন। তবে এই উপলক্ষ্যে বর-বধূর ধনী আত্মীয়-স্বজনেরা যদি উপহার দেবার মত কতকগুলি ছবি বা কারু-কলার নিদর্শন ডুভিনের কাছ থেকেই কিনত, তাতে তাঁর কি অপরাধ!

কোনো ভাল ছবি বা অন্য আর্টের নিদর্শনের উপর ডুভিনের একবার নজর পড়লে যতক্ষণ না সেটি সংগ্রহ হত ততক্ষণ তিনি পাগলের মত হয়ে থাকতেন এবং এগুলি সংগ্রহের জন্য তিনি যা দাম দিতেন তা অনেক সময় এত বেশী যে তার কাহিনী কিংবদন্তীর মত বিস্মিত—রসনায় রসনায় ঘুরে বেড়াত। আবার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বেসাতি সম্বন্ধে তাঁর ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। একবার এক অতি সম্ভ্রান্ত ডিউক, ইংল্যাণ্ডের আর্ট ডিলার টমাস এ্যানড্রু এ্যাণ্ড সন্‌সের একটি ছবি কেনবার মতলব করছিলেন। ডুভিনের মতের উপর তাঁর ছিল অপরিসীম বিশ্বাস; তাই তাঁকে নিয়ে গেলেন ছবিটি দেখাতে। ডুভিন একবার মাত্র তাকিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে' বললেন, "চমৎকার! ছবিটি সত্যই সুন্দর। তবে কি জানেন মি লর্ড, ছবির এই অপার্থিব বালকগুলি পরস্পর অনুরক্ত, যৌন বিকৃতি সম্পন্ন—পাপী।" এরপর ছবিটি অবশ্য আর কেনা হল না, কিন্তু তার কিছুদিন পরে অনেক হাত ঘুরে' সেই ছবিটিই যখন ডুভিনের আর্ট-গ্যালারীর সম্পত্তি হল তখন অবশ্য বালকগুলির চারিত্রিক দোষ আর রইল না! আবার নিউইয়র্কের এক লক্ষপতি চিত্র-সংগ্রাহক ষোড়শ শতাব্দীর একটি ইতালীয় ছবি কেনবার মতলবে ডুভিনের মত জানবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে এলেন ফিফ্‌থ্ এ্যাভেন্যুতে তাঁর বিরাট প্রাসাদে। যতক্ষণ ডুভিন ছবিটি দেখছিলেন তাঁর মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি রেখে ক্রেতা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডুভিন নাক কুঁচকে দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, "কাঁচা রঙের গন্ধ পাচ্ছি! বলছিলেন না, ষোড়শ শতাব্দীর ছবি?" অপরের ছবি সম্বন্ধে ডুভিনের এইসব মতামত অনেক সময় বহু বৎসরব্যাপী মামলায় পরিণত হয়েছে এবং বহু লক্ষ টাকা খরচ করিয়েছে। এইসব মামলার মীমাংসার জন্য অনেকবার লণ্ডন, নিউইয়র্ক এবং প্যারীর আদালতে আন্তর্জাতিক শিল্প-সমালোচকদের বৈঠক পর্যন্ত হয়ে গেছে।

ডুভিনের জীবনের সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা ছিল এই যে, অ্যামেরিকার লক্ষপতিদের মেজাজ ছিল ঠিক তাঁর বিপরীত। তাঁরা কথা বলতেন, ভাবতেন ধীরে-সুস্থে, অত্যন্ত সাবধানে। তাঁদের মনের হদিস পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। মনস্থির করতে তাঁরা এত সময় নিতেন যে তৎপর ডুভিন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠতেন। প্রত্যেকটি শব্দ নির্বাচন যেন নিরাপদ হয়, তার জন্য তাঁরা দম নিয়ে নিয়ে কথা বলতেন, যাতে হঠাৎ পিছলে যেন মত দেওয়ার অতল তলে তলিয়ে না যান। ডুভিন ছিলেন ফূর্তিবাজ আর ছটফটে, এইসব সন্দিগ্ধমনা লোকগুলির সঙ্গে কথা বলতে তাঁর যেন চিত্তদাহ উপস্থিত হত। এঁদের কারুর চিঠি বার কুড়ি পড়েও, প্রত্যেকটি ঘোরাল লাইনে অনেকবার মাথা খুঁড়েও পাঠোদ্ধার না করতে পেরে বিরক্ত হয়ে সেটি তিনি তার সেক্রেটারীর দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলতেন "দেখ ত লোকটি কি বলতে চায়। ছবিটা কিনবেন, না কিনবেন না?" আবার এক এক সময়ে ভারী মজার দৃশ্যের অবতারণা হত। তাঁর সেক্রেটারীকে তার কোনো ধনী ক্রেতার মত কোরে সাজিয়ে, তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত কোরে তিনি গায়ের ঝাল মেটাতেন! সে এক কৌতুকপ্রদ দৃশ্য।... (চলবে)

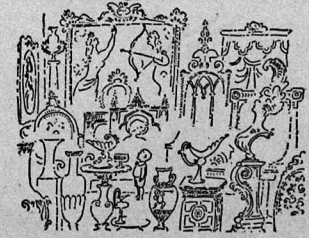

লোকসঙ্গীত

সুর বাহার

বাংলা দেশের ও আসামের লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা।

জাতির লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি তার দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের অভিব্যক্তি হোতে। পল্লীজীবনের আনন্দ বেদনা সুখদুঃখের বহু বিচিত্র স্মৃতি এই লোকসঙ্গীতই বহন কোরে এনেছে এতদিন। শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, লোকের সামাজিক জীবনের নানা সাময়িক বিশিষ্ট ঘটনা নিয়ে বহু গান রচিত হোয়েছে—গাঁথা হোয়েছে প্রচুর ছড়া। পল্লীর সমাজ-জীবনের উপর ধর্মীয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যা কিছু আলোড়ন ঘটেছিল এবং এই আলোড়নের ফলে তাদের জীবন যেভাবে সুখদুঃখে অভিভূত হোয়েছিল—তাই নিয়ে কবিরা নানা গান রচনা কোরেছেন। নানা কাহিনী গাঁথা হোয়ে রয়েছে গীতিকাব্যে। —আর জনশ্রুতির মাধ্যমে ভাষায়, সুরে তা মুখর হোয়ে উঠেছে সঙ্গীতে। উপরন্তু গ্রাম্যজীবনের এইসব লোকসঙ্গীতে প্রণয় কাহিনীর মনোরম অভিব্যক্তিও বাদ পড়েনি। তারা যেমন মধুর, তার আধ্যাত্মিক আকুলতাও তেমনি সুন্দর। সমাজ জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনী ছাড়াও মাঝির গান, রাখাল ছেলের প্রাণের আবেগ, জলদস্যুদের অত্যাচার, নারীর সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ, পশুপক্ষী, গাছপালা, লতাপাতা আদি প্রকৃতির বিচিত্র অবদানের বর্ণনাও এইসব লোক-সঙ্গীতে অতি সুস্পষ্ট।

এইরূপ সামাজিক নানা ঘটনার ঘন-ঘটায়, ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক বন্দনার নানা বর্ণনায় বিভিন্ন লোক-গীতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা দেশে কীর্তন, রামপ্রসাদী, মঙ্গল গান, অষ্টাপদী তর্জাগান এবং এ ছাড়াও প্রতিটি পালা-পার্বনের উদ্দেশ্যে রচিত অসংখ্য পল্লীগীতি বাংলা লোক-সঙ্গিতের ভাণ্ডার যেমন ভরপুর কোরে রেখেছে তেমনি আসামের লোকগীতিও পর্বত, গহীন জঙ্গল, উদ্দাম নদীর পরিবেশে পরিপুষ্ট শুধু নয়—প্রাণোচ্ছলও বটে। আসামের লোকগীতি আজও তাই একান্ত সচল এবং অতিশয় জনপ্রিয়। আসামের সমাজজীবনে আজও তার অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

বাংলার লোকসঙ্গীতে বাউল ও কীর্তন যে এক সবিশেষ স্থান অধিকার কোরে আছে এ কথার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। বাউল অথবা কীর্তন শ্রবণে বাঙালী মাত্রেরই হৃদয় রসাবেশে আপ্লুত হয়। বাউল সঙ্গীতে একাধারে যেমন উচ্চস্তরের দার্শনিক মনোভাব পাওয়া যায়—আবার তেমনি অঙ্গে তার খাঁটি বাংলা মায়ের মাটীর আঘ্রাণ লেগে—বাংলার গ্রামের এক অপূর্ব সুখদুঃখের ছবি তাতে বিদ্যমান। ভগবৎ প্রেমপাগল ভক্ত বাউল সহজিয়া প্রেমের সাধক। সহজ বা মানবীয় প্রেমের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের অপার্থিব প্রেমলাভ করার জন্য তাদের সাধনা। বাংলার বাউল কীর্ত্তন ভাটিয়ালী যেমন বাঙালীর নিজস্ব, আসামের বিহুগীত, বড়গীত, বনগীতও তেমনি আসামের একান্ত অন্তরঙ্গ।

বাঙালী পদকর্তাদের রচিত কীর্তন গানের ভক্তিভাব—তাদের সরস আকুলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছলতার যে আবেদন ফুটে উঠেছে—আসামের বড়গীতের পদরচনার

মধ্যেও একইরকম ভক্তিভাব ও সরস আকুলতার আকর্ষণ অনুভব করা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের যে আবেগ, যে আকুলতা—আপার্থিব হোয়ে উঠেছে—সেই প্রেমের অপার্থিব ভক্তি-ভাবই বাংলার কীর্তন বাউলে বিরাজমান।

···ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর···

কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই ধরনের প্রেমের বহুবিধ উচ্ছ্বসিত

বাংলাদেশে কীর্তন গানের রসধারা শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে যেমন উৎসারিত হোয়েছিল তেমনি শ্রীশঙ্করদেব ও মাধবদেবের সময় হোতেই আসামে এই বড়গীতের প্রচলন প্রবাহিত হোয়েছিল। অবশ্যি যদিও প্রাক্ শাঙ্করী যুগে অসমীয়া গীতিকাব্যে বড়গীতের স্থান সমৃদ্ধশালী হোয়ে উঠেছিল হেম সরস্বতী, রুদ্র কন্দলি, মাধব কন্দলি এঁদের দ্বারা—তবুও প্রকৃতপক্ষে বড়গীতের বহুল, প্রচলন হয় এই শাঙ্করী যুগ হোতেই। কারণ শঙ্করদেব ও মাধবদেব—এই দুই মহাপুরুষ সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার কোরেছিলেন—যেমন চৈতন্যদেব

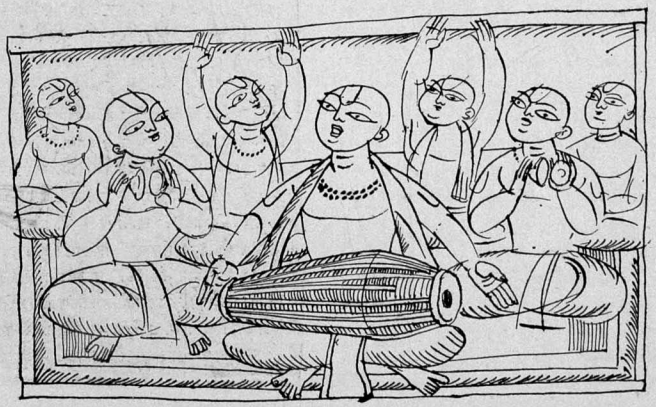

মূর্ত্ত হোয়ে ওঠা বাংলার কীর্ত্তন।

ভাবাবেগে বাংলার কীর্তনে যেমন মূর্ত হোয়ে উঠেছে, অসমীয়া ভক্তি-মূলক গীতিতেও রামের প্রতি সীতার প্রেমের আকুলতাও কম উপেক্ষণীয় নয়—

ময়ো বনে যাওঁ স্বামী হে
অ' স্বামী নকরা নৈরাশ
তোমারে লগতে স্বামী, খাটিম বনবাস হে ॥

রাধার মত সীতারও এইরূপ হৃদয় বিদারক আবেদনেও সমবেদনা না জানিয়ে পারা যায় না।

করেছিলেন বাংলাদেশে। আসামের নামঘরে অথবা কীর্তন ঘরে (যাকে বলা হয় উপাসনা ঘর) ধর্মপ্রচারকেরা সমবেত হোয়ে খোল এবং করতাল সহ তালি বাজিয়ে গান কোরে কোরে সাধারণ লোককে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট কোরতেন। এই সকল গীত হোচ্ছে ভক্তিমূলক। ভগবৎ-ভক্তির উচ্ছ্বাসভরা ভগবানের অশেষ গুণকীর্তন অথবা লীলাবর্ণনার প্রয়োজনে যে সঙ্গীতের উদ্ভব তারই নাম হোয়েছে কীর্তন। কীর্তন মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলা

বিষয়ক কাহিনী নিয়েই রচিত। বাংলার এই কীর্তনের মতই আসামের বড়গীতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাত্ম্য প্রচার করা হোয়েছে। আসামের এই বড়গীত মৈথীলি এবং অসমীয়া ভাষার সংমিশ্রনে রচিত এবং দাস্যভাব প্রধান। এর ভক্তিরসে ভক্তহৃদয়কে ভগবৎ প্রেমে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত কোরে তোলে।

কীর্তন :—

আজ বিপিনে, আওত কান
মুরতি মুরতি কুসুম বান
জনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর মোহিনী।

বড় গীত :—

বিরিন্দ্রাবনে রঙ্গে চলতু শ্যামরাই—
অঙ্গ ত্রিভঙ্গভাবে মোহন মুরলী রবে
সুমধুর পঞ্চম বোলই—
ইত্যাদি—

উপরক্ত কীর্তন ও বড়গীতের পদরচনায় এক অপূর্ব শব্দ ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয় নি কি?

সুরের দিক থেকেও রাসলীলা কীর্তনের সঙ্গে বড়গীতের কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এমনকি দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী বা তানের ভঙ্গীর সাথে অসমীয়া বড়গীতের কায়দার বহুলরূপে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বোলে কোন কোন বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ কোরেছেন।

অবশ্য, আসামের বিহুগীতই অসমীয়া লোকসঙ্গীতের মধ্যে আজও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, এমন কি আসাম ছাড়া অন্য প্রদেশেও এই লোক-সঙ্গিতটি সুপরিচিত। চৈত্রের শেষে বিহু উৎসবের আগমন আকাঙ্খায় প্রতিটি অসমীয়ার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার আসে। এই দিনটিতে, যে যত দীন দরিদ্রই হোক না কেন, যত দুঃখেই ভারক্রান্ত হোয়ে উঠুক না তার হৃদয়—তবুও বিহুর আনন্দে তার ক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটবেই।

অতিকৈ চেনেহর মুগারে মহরা
অতিকৈ চেনেহর মাকো
তাতোকৈ চেনেহর বহাগর বিহুটী
নেপাতি কেনেকৈ থাকো।

আসামের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিহুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—আর তাই বিহুগীতের এত বহুল প্রসার। এই বিহুর দিনেই প্রেমের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিকতাই অসমীয়া লোকের অন্তর অভিভূত করে। এই পবিত্র দিনটিতে লোকে সব দুঃখ-দৈন্য ভুলে যায়—ভুলে যায় সব শত্রুতা। শত্রুকে বুকের কাছে টেনে নয় ভাই বোলে। মেয়েরা

একতারা হাতে বাউল।

নিজের হাতে কাপড় বুনে প্রিয়জনদের উপহার দেয় প্রীতির নিদর্শনস্বরূপে। গোয়ালে গরুবাছুরদের নতুন দড়ি দিয়ে বাঁধে, ওদের লাউ, বেগুন, খাওয়ানো হয়—আদর যত্ন

গাজীর পট।

কোরে স্নান করানো হয়—এই সবই বিহুর একটা অঙ্গ। আসামের বিহুগীতেও বাংলার ভাটিয়ালী সুরের বেশ কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

তখনকার দিনে অসমীয়া লোকসকল গীত এবং 'নামের' মধুর সুরে প্রাণের অন্তরতম কথা ব্যক্ত কোরতো। পুরনো অসমিয়া সাহিত্যে লোকগীতি সম্পদেই ভরপুর। অসমীয়ার বিহুগীতই যে কেবল পুরাতন, গীতিসাহিত্যের প্রাণস্বরূপ—এমন নয়। আরোও অন্যান্য লোকসঙ্গীতেও গীতিকাব্য সমৃদ্ধশালী হোয়ে উঠেছে। যেমন বড়গীত,

বনগীত, বিয়ানাম দেহবিচারের গীত, নাওখেলা গীত, গাঁওলিয়া গীত, সাধুকতা গীত, ধাইনাম, হুচরিনাম, আইনাম, জিকির প্রভৃতি ভারতের ভিতর লোকসঙ্গীতে সত্যিকার উঁচু আসন দাবী করতে পারে।

হুচরি নাম প্রায়ই বিহুগীতের ন্যায়। মাঘ মাসের ভোগালি বিহুতে এই গান গাওয়া হয়। শীতকালে গ্রাম্যজীবন অপূর্ব সুন্দর হোয়ে ওঠে নানারকম ফুলে-ফসলে। তাদের গৃহপ্রাঙ্গণ ছেয়ে যায় শাকসব্জী, কপি, আলু ইত্যাদি নানান তরি-তরিকারিতে। বিহুর পূর্বদিন রাত্রে ছেলেরা দল বেঁধে প্রতিটি দুয়ারে দুয়ারে গাইবে এই হুচরি নাম। আর তাদের

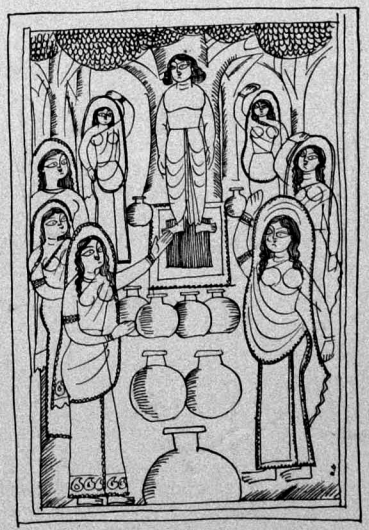

ধামাইল নৃত্য।

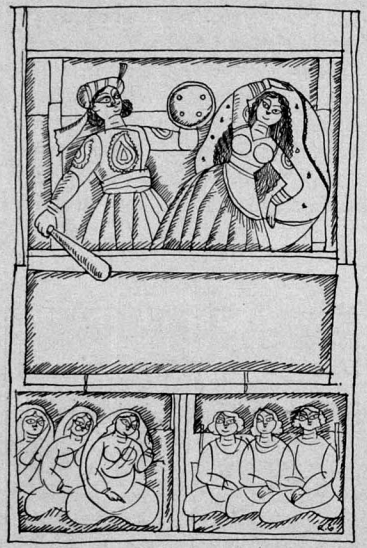

পুতুল নাচ।

গৃহদালানে যা পাবে শাকসব্জী তা উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় তারা।

ছচরি বাই ঔ দলৌ চরাই
রূপ চারি টকা, তামোল শরাই
ছচরি বাই ঔ পেঁপাই নিলে চোরে
কেনেকৈ নো পাতিছিলি বাপেরে
পুতিরে—ইত্যাদি।

আসামের নাওখেলা গীতের সঙ্গে অনেকটা বাউল গানের তুলনা করা চলে। এই গীত আসামের কামরূপ

জেলায় বিশেষ প্রচলিত। মাঝিরা নৌকা চালাতে চালাতে এই গানগুলো দাঁড় টানার সময় গাইতে থাকে। এই লোকগীতির এক বিশেষ দার্শনিক ভাব আছে। বাউলের উদাসকরা, পাগল করা কথা ও সুরের ব্যঞ্জনা এই নাওখেলার গীতেও পরিলক্ষিত হয়।—

আমি ভাই ক্ষেপা বাউল আমার দেউল
আমারি এ আপন দেহ
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
আন্তরে মন্দির গেহ।

বৌ নাচ।

ক্ষেপা বাউলের অন্তরের মর্মস্পর্শী আকুলতা ভক্ত হৃদয়কে ভগবানের নিকট নিয়ে যায়।

কানাই পার কররে বেলির দিকে চায়া
নষ্ট হৈল দুধের ভাণ্ডার বাজার গৈল বৈয়া
কাঠর দেশত থাকা কাঠর কিবা সুখ
ভাঙা নৌকাত পার করি কিবা পোয়া সুখ ॥

পদটীর দার্শনিক মনোভাব সত্যি অতুলনীয়।

মাঠে গরু চরাতে চরাতে রাখাল ছেলে মনের আনন্দে গান গায়। এই গানগুলি রাখাল বালকের সরল প্রাণ থেকে নিঃসৃত হওয়া—

হুর হুর বটা চরাই
মোর ধান নাখাবি
তোক দিম গোটা করাই
ধানো খাম চাউলো খাম
তোক বিয়া করাই ঘরলৈ যাম।

আসামের বিয়ানামও বিহুগীতের ন্যায় অত্যন্ত পুরাতন। বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়ির বৌ-মেয়েরা সমবেত ভাবে এই সকল গীত গেয়ে থাকেন। অধিকাংশ অসমীয়া বিয়াগীতই মেয়েদের মুখে মুখে রচিত হোয়ে এসেছে। জোরনের (গায়ে হলুদের) সময়,হোমের নিকট উপবেশনের সময়, এই সমস্ত গান গাওয়া হয়—

শহুরেক জোঁয়ায়েক দুয়ো বহিলে
রত্ন সিংহাসন পারি
বশিষ্ট পুরোহিত একোষে বহিলে
আগত লৈ হোমরে মারি।

আসামে মুসলমান বসতির সঙ্গে মুসলমান লোকগীতি

অসমীয়া লোকগীতিতে মিশ্রিত হোয়ে এদেশের গীতিসম্পদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এছাড়া আসামের আরও অনেক লোকগীতি আছে। বাংলার পল্লীগীতির ন্যায় আসামের গাওঁলীয়া গীতও সুন্দর। আসামের ওজাপালি গীতও অতি উচ্চ স্তরের। রামায়ণ-মহাভারতের পদ হোতে সুরু কোরে 'ওজা ভায়রীয়াগণ' এই গান করেন। আর একটা কথা—একদা এই লোকগীতির ভিতর দিয়েই আসামের রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ হোয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপে মনিরাম দেওয়ানের গীতের কথা বলা যায়। তখনকার দিনে ইংরেজরা দেশের লোকদের কায়দা কোরে আফিং-এ অভ্যস্ত করিয়ে নির্জীব প্রায় কোরে তুলেছিলো। মনিরাম দেওয়ান এই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। এই দেশ-প্রেমিকের কাহিনী নিয়েই লোকগীতি রচিত হোয়েছিল এবং অন্দরমহলের মেয়েরাও এই গান গাইতে গাইতে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হোতেন।

লোকগীতির মত এই অমূল্য সম্পদ মাঝে একেবারে লুপ্তপ্রায় হোয়েছিল। সুখের বিষয়, স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই আমাদের কলাকৃষ্টির ব্যাপারে জাতীয় সচেতনতার দরুন এর প্রতিষ্ঠার ও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে এবং আমাদের দেশের জনসাধারণও দেশের এই পুরানো সম্পদ বাঁচিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট তৎপর হোয়েছেন। আশা করা যায় এভাবে সাংস্কৃতিক আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে এবং লোক-সঙ্গীতের সার্বজনীনতার মারফত আমরা আরও তাড়াতাড়ি সর্বভারতীয় মিলনের পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

ভাটিয়ালী।

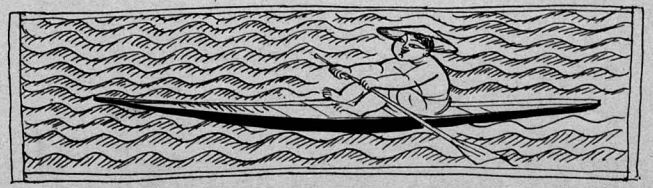

আলেখ্য

বিষ্ণু দে

কি করে' যে বলো কুসংস্কার? তাকে
দেখ যদি কোনো টাট্‌কা সকালে, সবে
স্নান সেরে ভিজে
চুল মেলে দিয়ে শুরু করে তার দিন,
তাহলে দেখবে তোমাদেরও মনে হবে,

যতোই বাঁধুক তাগায় তাবিজে ভয়ে উদ্বেগে আশায়
নিজেকে এবং আপনজনকে, নানা
বিশ্বাসে আর ঐতিহ্যের ভাষায়,
তবু যেন তার শরীরের তনু নম্রতা
হৃদয়ের এক দিনরাত্রির নিয়মিত নিষ্ঠাই।

প্রাচীন দেশের দীর্ঘ জটিল বিন্যাসে
—যেখানে বাবুর সমাজে আজকে মনের প্রাণের পক্ষে
দুদণ্ড টেঁকা দায়
জীবিকার দায়ে ছাড়া—
দেখ দেখ চেয়ে জীবনের সেই দেশে
ভিজে চুল মেলে সদ্য পট্টবাসে
গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী বাংলাদেশের মেয়ে,
করুণায় স্মিত, প্রথমে কুমারী, বয়সে সেবাব্রতা ॥

বাংলা নাট্যশালার দর্শক

অমল মিত্র

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিদেশী রঙ্গালয়ের অনুকরণেই আজকের বাংলা নাট্যশালা গড়ে উঠেছে। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন যাত্রাভিনয় ও তার ক্রমবিকাশের চেহারা নিঃসন্দেহ এ নয়। কলকাতার ইংরেজী রঙ্গালয়ই এর প্রতিষ্ঠা ও প্রেরণার উৎস। কী ভাবে ধীরে ধীরে ঐ ধরনের রঙ্গালয়ের প্রতি একে একে বাঙালী দর্শকরা সব আকৃষ্ট হল, যাত্রার আসর ছেড়ে তারা কেমন করে বসল এসে বিদেশী ধরনের প্রেক্ষাগৃহে এখন সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

সে আজ অনেকদিনের কথা যেদিন প্রথম ইংরেজী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের প্রাসাদপুরী কলকাতার চেহারা সেদিন ছিল ভিন্ন। বন-জঙ্গলে ঢাকা, আঁধার সমাচ্ছন্ন। এমন কি এই ঝক্‌ঝকে চৌরঙ্গীর অবস্থাও ছিল অনুরূপ—গভীর জঙ্গলাবৃত ও শ্বাপদসঙ্কুল। সেন্ট পল্‌স গীর্জার আশেপাশে হাতীর পিঠে চড়ে বাঘ শিকার করতেন প্রবল প্রতাপ ওয়ারেন হেস্টিংস। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যার পর দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের প্রলোভনেও কোনো

পাল্‌কি-বেয়ারা ও-অঞ্চলে যেতে রাজী হত না। এমনি ভয়াবহ ছিল আজকের জনাকীর্ণ সুশোভিত চৌরঙ্গী। শুধু লালদীঘি অঞ্চলে কিছুটা স্থান সংস্কার করে সেদিনের ইংরেজ তার কাজ-কারবার ও বসবাস সুরু করে। তাই সেখানেই গড়ে ওঠে তার প্রথম গীর্জাঘর, কেল্লা, সুপ্রীমকোর্ট, জেলখানা, হাঁসপাতাল প্রভৃতি সব কিছুই। তাই প্রথম রঙ্গালয়ও ওইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা তথা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী পলাশীর যুদ্ধেরও আগের একথা—। তখনকার দিনের সেইসব প্রবাসী বহু ইংরেজকেই হয়ত নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আনন্দ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছিল এ-রঙ্গালয়। তারপর, মর জগতের সব কিছুরই মত, এরও জীবনলীলা একদিন সাঙ্গ হ'ল—১৭৫৬ সালে যৌবনোদ্দীপ্ত নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কলকাতা অবরোধ করলেন। লালদীঘি অঞ্চলে সেণ্ট্ এ্যান্স গীর্জা প্রভৃতি অনেক কিছুর সঙ্গে এই রঙ্গালয়ও দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হল। চিরদিনের মত সেখানকার পাদপ্রদীপের আলো নিবে গেল। এক নিলাম ঘর হল সেখানে প্রতিষ্ঠিত। একদা যেখানে নিপুণ শিল্পীদের সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তি ও অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত দর্শকদের, সেখানে বছরের পর বছর ধ্বনিত হল কণ্ঠস্বর নিলামদারের! যাইহোক, সংবাদপত্রের আবির্ভাবেরও পুর্বে প্রতিষ্ঠিত এ রঙ্গালয়টির অবস্থান এবং শেষ পরিণতির বিষয় টুক্‌রো টুক্‌রো দু'একটা সংবাদ ছাড়া বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে, কোনো বাঙালী দর্শকের যে সেখানে আনাগোনা ছিল না, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেন-দেন-এর সূত্রে মুষ্টিমেয় বাঙালী ইংরেজের সংস্পর্শে এলেও, তাদের নাটক বা তার অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার কোনো কারণ বা সুযোগ তখনো তাদের ঘটেনি। প্রচলিত যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির আসরেই একমাত্র ছিল তাদের আনাগোনা।

যাই হোক, প্রথম রঙ্গালয়ের বিলুপ্তির পর বেশ কিছু-কাল কেটে গেল। সেটা সুদীর্ঘকালও বলা চলে। পলাশীর যুদ্ধ ও আরো অনেক কিছুই ঘটে যাওয়ায়, এদেশের বুকে ক্রমশঃ নিরঙ্কুশ হতে লাগল ইংরেজ আধিপত্য। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব মন নিয়ে তাই কলকাতা গঠনে মন দিল তারা। লালদীঘি অঞ্চলের উন্নতিসাধন তো হলই, চৌরঙ্গীরও চেহারা গেল বদলে। শতাব্দী কালের পুরানো কত বিশালকায় বনস্পতি সেখানে নির্মূলিত হ'ল। একদা তাদের বিস্তৃত ডালপালার ছায়ায় কত পথশ্রান্ত পথিক ক্লান্তি দূর করেছে। আবার, সন্ধ্যার পর লুণ্ঠনকারী কত দুর্বৃত্তও আত্মগোপন করেছিল একদিন তাদের আড়ালে-আবডালে। যাইহোক, একটির পর একটি বাড়ি সেখানে মাথা খাড়া করে উঠল। ওদিকে গঙ্গার ধারের গোবিন্দপুর গ্রামেরও যথেষ্ট অদল-বদল ঘটল। বহুদিনের বাস উঠল সেখানকার অধিবাসীদের। ইংরেজ অধিকার করল সে অঞ্চল এবং সুদৃঢ় করে সেখানে নির্মাণ করল আজকের বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা। সুদূর প্রবাসে অবসর বিনোদনের জন্যে রঙ্গালয়ও প্রতিষ্ঠিত হ'ল আবার। বড়লাট থেকে সুরু করে সেদিনের সকল বিশিষ্ট ইংরেজেরই শুভেচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এর পিছনে। শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, তাঁর গিরীশচন্দ্র বক্তৃতায় বলেন—"ইংরেজ যে স্থানেই বাস করে, সেই স্থানেই আনন্দ সম্ভোগ কল্পে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।"

কলকাতায় ইংরেজ ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার ব্যবসা বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করেছে তখন। সেই সূত্রে এবং কোম্পানীর অধীনে কার্যোপলক্ষে মহারাজা নবকৃষ্ণের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী সেদিন ইংরেজের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। নানাকারণে তাদের বন্ধুত্বপাশেও আবদ্ধ হয়েছেন অনেকেই। ইংরেজের উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁদের যাতায়াত ছিল। ইংরেজও এঁদের উৎসব আয়োজনে যোগ দিত। তাই মনে হয়, বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ওই রঙ্গালয়ে কয়েকটি ধনী বাঙালী দর্শকের সমাগম হ'ত। বিশেষ করে প্রভূত অর্থশালী মহারাজা নবকৃষ্ণ সেখানে যেতেন বলেই মনে হয়। ইংরেজের নাট্যশালার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ না থাকলে সে যুগের শ্রেষ্ঠ এক অভিনেত্রী ও নর্তকী সুন্দরী এমা র‍্যাংহামকে কখনই আপন গৃহে তিনি অভ্যর্থিত করতেন না। তবে মুষ্টিমেয় ধনী বাঙালীর প্রবেশাধিকার থাকলেও সাধারণ বাঙালী দর্শকের যে সে অধিকার ছিল না তা বলা বাহুল্য। তখনো তারা অন্যান্য ধনীগৃহের বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গন বা বারোয়ারী তলার যাত্রার আসরেই দখল কেরে। সারারাত কাটিয়ে দেয়, কালীয়দমন প্রভৃতি পালা শুনে—এতটুকু ক্লান্তি

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

অনুভব করেনা। বিদেশী নাট্যশালা বা নাটক অভিনয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগই তাদের ঘটেনি—প্রয়োজনও অনুভব করেনি বলেই মনে হয়।

যাইহোক, ১৭৮০ সালে এদেশে প্রথম সংবাদ পত্রের আবির্ভাব ঘটল। সেদিনের রঙ্গালয় সম্বন্ধে তাতে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশও সুরু হ'ল। তার বিজ্ঞাপন, সেখানকার অভিনয়ের সমালোচনা ইত্যাদি নানা সংবাদ। ১৭৯৫ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত এমনি এক খবর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুধু বিদেশী নয়, এদেশীয়দেরও। কলকাতার ডুমতলা অঞ্চলে (অধুনা এজ্‌রা ষ্ট্রীট) এক বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ দিল বিজ্ঞাপনে। আরো অনেক কথা জানালো। যেমন, কবে এবং কোথায় অভিনয় হবে, নাটকের নাম, প্রবেশ পত্রের মূল্য ইত্যাদি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে তাও জানাল। বিজ্ঞাপন এও বলল যে, শিল্পীরা সকলেই এদেশী এবং স্ত্রীলোকের ভূমিকায় মহিলারা অংশ গ্রহণ করবেন। অভিনব এ সংবাদে সেদিনের আধাশহর কলকাতায় বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। বিশেষ করে বাঙালী মহলে। রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অবশ্য এদেশীয় নন। সুদূর রুশদেশবাসী একজন, নাম গেরাসিম লেবেডেফ্। কোনো বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। তাই, এদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়ে গেছে। তিনিই বাংলা নাট্য-শালার জনকের গৌরব অর্জন করে গেছেন। যাইহোক, ১৭৯৫ সালের ওই রঙ্গালয়ে বাঙালী দর্শকদেরও সমাগম হয়েছিল বলেই মনে হয়। বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত ও ধনী বাঙালী নাট্যরসিকদের। সেদিন অনুভূত হল যে সমাজের উপরতলার বাঙালীদের রুচি পরিবর্তন ঘটছে। এটা ইংরেজদেরর সংস্পর্শে এসেই ঘটেছিল। অর সেই কারণে তাই, ওদেশীয় ধরনে এক বাংলা নাটকের অভিনয়ের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গীক হবে না বোধহয় যে অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন ছাপলেও প্রথম বাংলা নাট্যশালাটির অন্যান্য কোন খবর সম্বন্ধে সেদিনের পত্রিকা নিশ্চুপ। তার দর্শকসমাগম, অভিনয় ইত্যাদি সম্বন্ধে যা কিছু সংবাদ পাই তা ওই লেবেডেফএর কাছ থেকেই। এর প্রতিষ্ঠায় সেদিনের ইংরেজ বা তার পত্রিকা খুসি হয়নি। অন্ততঃ লেবেডেফের তাই মত। মাত্র দু'রাত্রি অভিনয়ের পর চিরদিনের মত যবনিকা পড়ে যায় ওই রঙ্গমঞ্চের ওপর। অভিনয়ের কোন দোষত্রুটির কারণে নয়। ইংরেজ পরিচালিত রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের দারুণ শত্রুতার কারণেই বাংলা নাট্যশালাটি বন্ধ হ'ল। এ সংবাদও লেবেডেফই দিয়ে গেছেন। লণ্ডনে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ভোরসভ্‌কে ১৭৯৭ সালে একটি পত্রে তিনি লেখেন "……আশাকরি আপনি বিশ্বাস করিবেন যে, আমি শ্রমস্বীকার করিয়া অন্যান্য গ্রন্থছাড়া ডিজ্‌গাইজ্ নামে এক ইংরেজী কমেডির বাংলা অনুবাদ করিয়াছি। তারপর কোম্পানীর ম্যানেজার

আমাকে কোন নাট্যশালা ব্যবহার করিবার অনুমতি না দেওয়ায় আমি অবশেষে নিজেই সাহস করিয়া চারিশত দর্শকের উপযোগী এক নাট্যশালা নির্মাণ করি। এই নাট্যশালাতেই একমাত্র আমার চেষ্টায় ও ব্যবস্থায় দুই রাত্রি বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা বৃহৎ দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে উক্ত কমেডিখানা অভিনীত হয়। এখানকার পরশ্রীকাতর নাট্যশালাধ্যক্ষগণ যদি আমাকে না ঠকাইতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অর্থশালী হইতে পারিতাম। এখন আমি ইহাদের চক্রান্তের ফলে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এদেশের আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকদের নিকট হইতে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিয়া তাহা পাই নাই।……" ('দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬২)। শুধু তাই নয়, মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে জেলে পাঠাবার চেষ্টাও করা হয়েছিল। অবশ্য চক্রান্তকারিদের সে নীচ প্রয়াস ব্যর্থ হয়। দিনের পরদিন রঙ্গালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল ক্ষণের আশায় মিথ্যে অপেক্ষা করে, ভগ্ন হৃদয়, কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বদেশে ফিরলেন লেবেডেফ্। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসের চিরস্মরণীয় মানুষ গেরাসিম লেবেডেফ্ শেষ অবধি এই ভাবে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

এবার ঊনবিংশ শতকে আসা যাক। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটে এই শতকে। সাধারণ বাংলা নাট্যশালার অভ্যুদয়ও এই শতকেরই শেষ বরাবর হয়। সে কথা পরে আসবে। আগে এই শতকের গোড়ায় এদেশে যাত্রার কি অবস্থা এবং কেন তার দর্শকসংখ্যা দিনদিন হ্রাস পেতে লাগল, সে সম্বন্ধে কিছু বলি। কিছু কিছু নতুন পথে রূপান্তরিত হলেও তার মান নামতে নামতে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত মানুষকেও দুঃখ করে বলতে হ'ল 'সভ্যতা রক্ষা করে তা বর্ণনা করাও কঠিন।' তাঁর অননুকরণীয় ভাষাটি এখানে উদ্ধৃত করছি "……খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়-দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। ……" ('বিবিধার্থ-সংগ্রহ', মাঘ, ১৭৮০ শক) আবার, ওই শতকেরই প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা—দারুণ এক পরিবর্তন এনেছিল বাংলার যুব সম্প্রদায়ের ভিতরে। সেখানকার শিক্ষা দীক্ষায় 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের রুচি দিলে বদলে। অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যাত্রার প্রতি তাই তাঁদের আকর্ষণ গেল কমে। বিরূপ হল তাদের শিক্ষিত মন। তাছাড়া বিদেশী সাহিত্য ও নাটকের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে সেদিন। তখনকার ইংরেজদের থিয়েটার তাই আকৃষ্ট করল তাদের অনেককেই।

তবে, এরও আগে অর্থাৎ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠারও পূর্বে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী, রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন দেখি।—অবশ্য বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতি। 'লেবেডেফ্'-এর পর আর যে কোন বাংলা নাট্যশালা তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি তা বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য কারণে সকলেই এঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন। রুচি বদলও ঘটে তাই। প্রথমেই এঁদের মধ্যে যাঁর নাম করব তিনি হলেন সে যুগের স্বনামধন্য পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহনের পর এঁরই নাম সেদিন সকল বাঙালীর মুখে মুখে ফিরত। প্রভূত অর্থশালী, নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক দ্বারকানাথ একজন প্রথমশ্রেণীর শিল্পানুরাগী ছিলেন। এদেশী ও বিদেশী সঙ্গীতে তাঁর সমান অনুরাগের কথা ম্যাক্সমূলার, স্টোকলার প্রভৃতি অনেকেই উল্লেখ করে গেছেন। যাইহোক, প্রতিভাবান এই মানুষটি কলকাতার ইংরেজী রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। শুধু একজন দর্শক হিসেবে নয়, মালিক হিসেবেও। ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ এক রঙ্গালয়—চৌরঙ্গী থিয়েটারের মালিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। প্রাচীন পত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখা যায়, রঙ্গালয়টির সুদিনে-দুর্দিনে সবসময়ই দ্বারকানাথ তার পাশে রয়েছেন। এমন কি, ১৮৩৫ সালে যখন দেনার দায়ে রঙ্গালয়টি নিলামে উঠল, তখন দ্বারকানাথকেই তার একমাত্র ক্রেতা হিসেবে দেখা গেল। সেদিনের বিখ্যাত সংবাদ-পত্র 'ক্যালকাটা কুরিয়ার'-এর মারফত তা জানতে পারি। লিখেছে,—"The theatre at Chowringhee was put up to Auction at eleven O'clock this morning, and purchased by Baboo Dwarkanath Tagore, the only bidder, for 30,100 Rupees..." ('Calcutta Courier,' 15th

Aug, 1835)। গণ্যমান্য অনেকেই নিলাম ঘরে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ক্রেতা ছিলেন মাত্র একজন—দ্বারকানাথ। রঙ্গালয়টি কিনে তাকে ঋণ মুক্ত করলেন উদারমনা মানুষটি। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিন্তু অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটল। সর্বগ্রাসী এক আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই রঙ্গালয়। বহুটাকা লোকসান হোল দ্বারকানাথের। কিন্তু, তাঁর শিল্পীমন দমল না। পরবর্তী এক রঙ্গালয় সাঁ সুসির প্রতিষ্ঠাকালে আবার দেখি তিন হাজার টাকা চাঁদা পাঠালেন।

এক সুবর্ণমোহর বা ওই ধরনের উচ্চহার ছিল সেদিনের রঙ্গালয়ের প্রবেশ পত্রের। সাধারণ বাঙালী দর্শকের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, অভিনীত নাটক ও তাদের অবোধ্য। বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতি এই দু'কারণেই তাদের কোন আকর্ষণ বা আগ্রহ ছিল না। খুবই স্বাভাবিক। জমিদার বাড়ির চকমেলান প্রশস্ত উঠনে বা বারোয়ারী তলার সামিয়ানার নিচেই তারা নাট্যরস উপভোগ কোরত। মাত্র শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বাঙালীরাই ইংরেজ রঙ্গালয়ে যেতেন। দ্বারকানাথের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতি আরো অনেকে যেতেন। তাই ওই ধরনের এক নাট্যশালা গঠনের প্রশ্নও তাঁদের মনে জাগে। শুধু কল্পনায় পর্যবসিত হয়নি সে সদিচ্ছা—বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছিল তা। নারকেলডাঙ্গার বাগানে এক নাট্যশালা নির্মাণ করেন প্রসন্নকুমার। এদেশে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, এর দারোদ্ঘাটন হয়। অবশ্য ভাল নাটকাভাবে ইংরেজী নাটকই তাঁরা অভিনয় করেন। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার যে তোড়জোড় চলেছে সে কথা আগেই বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' জনসাধারণকে জানিয়ে দেয়। এও জানায় যে, "ঐ নাট্যশালা ইংলণ্ডীয়দের রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে—সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়।" হিন্দুকলেজ তখন বেশ কিছুদিন হ'ল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙালীর চিন্তাধারা, রুচি এবং সব কিছুতেই তার শিক্ষাব্যবস্থা প্রভাবান্বিত করেছে। বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতিও সেখানকার ছাত্রেরা যে আকৃষ্ট হয়েছে তা আগেই বলছি। কলেজের অধ্যক্ষ এবং ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনই প্রধানতঃ তাদের মধ্যে এই রঙ্গালয় প্রীতি জাগিয়ে তোলেন। সেখানকার এক কৃতি ছাত্র ও বাংলা সাহিত্যে চিরবরেণ্য, রাজনারায়ণ বসু, তার আত্মচরিতে লিখেছেন "তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'Are you going to the theatre to-day ?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।"

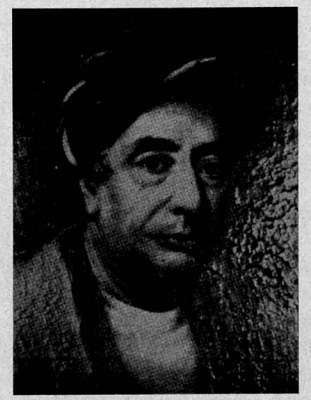

প্রসন্ন কুমার ঠাকুর।

যাইহোক, প্রসন্নকুমারের ওই রঙ্গালয়ে অনেক বাঙালী দর্শকের সমাগম হয়েছিল। অবশ্য, রাজা রাধাকান্ত প্রভৃতির মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙালী দর্শকের। বিদেশী দর্শকও কিছু কিছু ছিলেন। সকলেই তাঁরা নিমন্ত্রিত। জনসাধারণ সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নি। ধনীগৃহের নিমন্ত্রণ পত্র তাদের হাতে পৌঁছয় নি নিশ্চয়। তবে, এদেশীয়দের এক নাট্যশালার অভাব সংবাদ পত্রেরও দৃষ্টি

আকর্ষণ করে, এ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠারও আগে। ১৮২৬ সালে সেদিনের বিখ্যাত পত্রিকা, 'সমাচার চন্দ্রিকায়' এ সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। যথা —"এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই।..... ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে বেতনভোগী ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া একজন কর্মাধ্যক্ষের নির্দেশমত লিখিত নাটক অনুযায়ী মাসে একবার কাব্য আবৃত্তি করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী নির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।" দর্শকের মনে যে অদলবদল সুরু হয়েছে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সম্পাদকের এই উক্তি থেকে। প্রসন্নকুমারের মত এক অর্থশালী বাঙালীর পক্ষেই রঙ্গালয় নির্মাণ সেদিন সম্ভব ছিল। কিন্তু, বিত্তহীন সাধারণ মানুষরা ওই ধরনের কাজে অগ্রসর হতে না পারলেও, তারাও যে তাই চায় সংবাদপত্র তাই বললে।

নানাকারণেই যাত্রা সেদিন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। কলকাতার এখানে-ওখানে এবং গ্রামাঞ্চলে—এর পরেও বহু যাত্রার আসর বসেছে। নল দময়ন্তী, নন্দবিদায় প্রভৃতি অনেক নাটকই অভিনীত হয়েছে। কিন্তু আগের মত সকল শ্রেণীর দর্শককেই তা আর আকৃষ্ট করতে পারেনি। এক-দিন ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র একত্র বোসে রাত কাটিয়েছে সেই আসরে। মুগ্ধ হয়েছে নাটকে বর্ণিত উপাখ্যান শুনে, আর তার সঙ্গীতে। কিন্তু, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন, বিদেশী সাহিত্য ও নাটকের সঙ্গে পরিচিতি এবং এখানে ইংরেজী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা, বিরাট এক দর্শকগোষ্ঠীর রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিলে বদলিয়ে। একদিকে এই মানসিক পরিবর্তন, অপরদিকে যাত্রার অভিনয়, সাজসজ্জা সব কিছুরই ক্রমবর্ধমান অধোগতি, অনেককেই তার প্রতি বিরূপ করল। এছাড়া আর একটি কারণও ছিল মজার হলেও সেও একটি কারণ বটে। আর ঠিক এই কারণেই একশ্রেণীর দর্শকের মনে এই নতুন প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের প্রতি প্রীতি জাগাল। প্রসন্নকুমারের নবগঠিত নাট্যশালার প্রথম রাত্রের অভিনয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় একটি লোক পত্র লিখলেন, "·····অধিকন্তু সুখের বিষয় ইহাঁরা ধনিলোকের সন্তান ইহাঁরদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিয়দমনের ছোঁড়াগুলা সর্বদাই টাকা-পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রংগ ভংগ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় তা আপদ নাই।" সোজা কারণ নয় এ! মনে হয় সেদিনের অনেক যাত্রার আসরে এই বিরক্তিকর কারণে অভিনয় ভাল হওয়া সত্ত্বেও ধীরে ধীরে দর্শক সংখ্যা কমে যেতে লাগল।

যাই হোক্, শিল্পীদের সাজ-সজ্জারও ওই পত্র প্রেরক প্রশংসা করলেন। বললেন,—"ইহাঁরা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইংরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমার দিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল ধরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলি বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইংরেজাধিকারী তাহা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যেই সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।" এদেশীয়দের একটি রঙ্গালয় সবেমাত্র গড়ে ওঠার কালেই এই ধরনের তুলনামূলক সমালোচনা বেরোল। দর্শকমনে যে পরিবর্তন সুরু হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে নাট্যশালা যে সুপ্রাচীন যাত্রার স্থান অধিকার করবে এ যেন তারই এক ইঙ্গিত।

অল্পদিনের মধ্যেই উপরোক্ত সমালোচক এবং আরো অনেকেই বোধ হয় খুসী হলেন। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বাংলা নাট্যশালা হল এইটিই, কারণ কেবল বাংলা নাটকই সেখানে অভিনীত হোত। প্রসন্নকুমাররা তা করেননি। রঙ্গালয়টির প্রতিষ্ঠাতা আঠারো শতকের এক নামজাদা মানুষ কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র নবীনচন্দ্র বসু। কোম্পানীর অধীনে হুগলীর দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণরাম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য বলরামও এই পরিবারেই একজন। আজকের শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর স্থানে নবীনচন্দ্রের গৃহ ছিল। পুষ্করিণী, উদ্যান

সুশোভিত প্রাসাদতুল্য ছিল সে পরিবেশ।

অট্টালিকার সব কিছুই আজ বিলুপ্ত। শুধু, বাগান সংলগ্ন মন্দির, নিষ্ঠুর কালের হাত এড়িয়ে আজো পিছনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিনের অনেক কথাই মনে পড়ে তার দিকে তাকালে। যাক্, প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ওই নাট্যশালা দু'কারণে সেদিন কলকাতাবাসীদের চমৎকৃত করে। প্রথম, ইংরেজের অনুকরণে গঠিত এক রঙ্গালয়ে প্রথম এই বাংলা নাটক অভিনীত হল। দ্বিতীয়তঃ, সেদিনের নানা সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে বাস করেও নির্ভীক নবীনচন্দ্র রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের আহ্বান করেছিলেন। বিদেশী লেবেডেফ্-এর পক্ষে এ সহজ হলেও নবীনচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল না। যথেষ্ট দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছিলেন এই শৌখিন মানুষটি।

নবীনচন্দ্র বসু।

কারণ এর বহু বৎসর পরেও রঙ্গালয়ে অভিনেতৃদের যোগদান প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু আপত্তি জানিয়ে 'জাতীয় নাট্যশালার' প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় বলেন, "এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে···নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে রাজধানীতে—এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোন সম্প্রদায় কর্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এদেশে নাটকাভিনয়রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তি সাধক ধর্ম নীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ-সমাজ অবলম্বন

না করেন! অধিক আর বলিতে চাহি না।"

যাইহোক্, শুধু যাত্রাভিনয়েই অভ্যস্ত বহু দর্শকেরই নাট্যশালার সঙ্গে পরিচয় ঘটল এখানে। বিদেশী ধরনের এক নাট্যশালার সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়। অনেকেরই সে সৌভাগ্য হয়েছিল বোধ হয়। কারণ, এক রাত্রের সমাগত দর্শকের সংখ্যা দেখে মনে হয় সকলেরই সেখানে অবারিত দ্বার ছিল। ১৮৩৫ সালে অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হয়। 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রিকা তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন এক হাজারেরও উপর দর্শক সমাগম হয়েছিল সে রাত্রে। জাতিভেদ ছিল না। "হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানা জাতিরও" দর্শক উপস্থিত হয়েছিল। শ্রেণীবিভেদও ছিল বলে মনে হয় না। সেদিনে এক ধনীগৃহে অনুষ্ঠিত এ অভিনয়ে সাধারণ দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হয়েছিল হয়তো বা। অন্ততঃ তা অস্বাভাবিক নয়। যাইহোক, পত্রিকার মতে "সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত" হয়। যাত্রায় অভ্যস্ত দর্শকের মঞ্চাভিনয় ভালই লাগল। তারা খুশী হল।

এবার, বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সম্বন্ধে দু-এক কথা বলি। ও 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'-এর মতে অভিনয় সুষ্ঠু এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল। প্রায় সকল চরিত্রের অভিনয়ই তাদের ভাল লাগে। বিশেষ করে বিদ্যার ভূমিকায় ষোড়শবর্ষীয়া এক অভিনেত্রী রাধামণির অভিনয়। মুগ্ধ হয় তারা, তার অভিনয়নৈপুণ্যে। মালিনীর ভূমিকায় আর এক শিল্পী জয়দুর্গাও প্রশংসা লাভ করে। বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অভিনেত্রী, রাজকুমারী। পত্রিকার মতে "জয়দুর্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব" দেখিয়েছিল সে। দৃশ্যপট সম্বন্ধেও পত্রিকা তাদের মতামত জানাল। বললে, তা "সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই" এবং "... একটু নিপুণ হাতে পড়িলে.....আরও অনেক ভাল হইতে পারিত।" প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখ যোগ্য। বিশ্বকোষ বলেন প্রথমে সেখানে দৃশ্যসহ নাট্যশালার ব্যবস্থা হয়নি। সুপরিসর অট্টালিকার নানা স্থান জুড়ে অভিনয় চলত। নাটকের এক একটি দৃশ্য গৃহের এক একটি অংশে সজ্জিত করা হোত। যেমন, বীরসিংহের দরবারের দৃশ্য সুসজ্জিত বৈঠকখানায়, এবং তৃণগুল্ম আচ্ছাদিত উদ্যানসংলগ্ন পুষ্করিণী তীরে বকুলতলার দৃশ্যটি দেখান হয়। আজকের চলচ্চিত্র তোলার মতই ব্যবস্থা অনেকটা। দর্শকরা ঘুরে ঘুরে অভিনয় দেখত। প্রায় সারা গৃহই তারা প্রদক্ষিণ করত। 'বিশ্বকোষে'র লেখাটি উদ্ধৃত করা অন্যায় হবে না বলেই তা দিই :— "এই অভিনয়ে প্রথমে চিত্রিত নাট্যশালার ব্যবস্থা হয় নাই। নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী বাটীর নানাস্থানে প্রকৃত সাজসজ্জাদি দ্বারা সাজান হইয়াছিল। এক ঘর হইতে অন্য ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুড়ঙ্গ করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুষ্করিণীর দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যানের পুষ্করিণীতীরে সজ্জিত হইয়াছিল। বীরসিংহের দরবার সুবৃহৎ বৈঠকখানায় সাজান হইয়াছিল। অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যানের এক পার্শ্বে মালিনীর কুটীর ও মালঞ্চ গুছান হইয়াছিল। একস্থানের একদৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া অন্যদৃশ্য দর্শনের জন্য যেখানে সেইদৃশ্য সাজান হইয়াছে, দর্শকগণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত। প্রথম অভিনয়ে এইরূপে ছুটাছুটি করিয়া অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।" নাট্যরস পরিবেশনে নিঃসন্দেহে এক অভিনব আয়োজন এ। আজ, প্রেক্ষাগৃহের আসনে বসে থাকে দর্শক স্থির হয়ে। একের পর এক দৃশ্য ঘুরে যায় তাদের চোখের সামনে, আধুনিক রিভলবিং রঙ্গমঞ্চের উপর। কিন্তু, সেদিন দর্শক ছিল রিভলবিং দর্শক। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে—ছুটোছুটি কোরে—তাদের অভিনয় দেখতে হত। তবু নবনির্মিত নাট্যশালার আকর্ষণ এমনই যে, চিরদিন যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতিতে যাঁরা অভ্যস্ত তারা খুশীই হয়েই সে কষ্ট স্বীকার করলেন।

সেদিন এ নাট্যশালা শুধু নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও উন্নতি বিধান করবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। ক্ষণিকের দুর্বল মুহূর্তে পথ ভ্রষ্ট যে নারী চিরদিনের মত সমাজচ্যুত হোল, সেই অবহেলিতাদের ভদ্র উপায়ে অর্থোপার্জনের যেন এক পথ দেখিয়ে দিলেন নির্ভীক ও উদারমনা নবীনচন্দ্র। এ সম্বন্ধে 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'-এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য, যথা— ".....ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের উন্নতি করবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র .....ধনী-সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই

—যাহার দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে।"

যাই হোক্, পত্রিকা এবং দর্শকদের এই প্রশংসা বেশ মোটা দাম দিয়েই নবীনচন্দ্রকে শোধ করতে হয়। শোনা যায় প্রায় দু'লক্ষ টাকারও উপর তাঁর ব্যয় হয়েছিল এই রঙ্গালয় নির্মাণে। সেদিনের দু'লক্ষ টাকা! শেষ পর্যন্ত থাতা-বাড়ি নামে পরিচিত, মিলিটারী একাউন্টস্-এর বাড়িখানিও নাকিএই কারণে তাঁকে বেচতে হয়। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক উক্তি নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। তাই, সেটি উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করব। কবি লেখেন "কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"

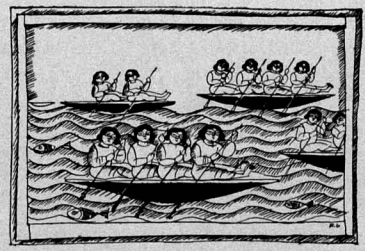

গ্রন্থ-জগত

গ্রন্থ, পত্র ও পত্রিকা-প্রকাশন-কলা বিষয়ক আলোচনা।

গ্রন্থকীট

শুধুমাত্র আমাদের দেশে নহে পৃথিবীর সর্বত্রই একটি অলিখিত রীতি হইল যে, কোনো নূতন কার্যে হাত দিতে হইলে প্রথমে গুরুজন ও পূর্বগামীদিগকে স্মরণ করিতে হয়। ইহা পৌত্তলিকতা নহে, ইহা সাংস্কৃতিক ঋণ-স্বীকার।

—'সুন্দরম' শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, নাট্য, চিত্রকলা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। অতএব ইহার আত্মপ্রকাশের শুভমুহূর্তে আমরা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বহু পুরাতন একটি শিল্প সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার প্রতি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য বোধ করিতেছি।

এই পত্রিকাটির নাম 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'। ১৮৮৬ সালে অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশকদ্বয়ের নাম শ্রীকালীদাস পাল ও শ্রীবিহারীলাল রায় এবং ৩৪৩ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ 'আর্টিস্ট প্রেসে' ইহা মুদ্রিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় শিল্পপুষ্পাঞ্জলিকে 'শিল্প, সাহিত্য,

১নং চিত্র : ফুলমালা।

সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন' বলিয়া বর্ণিত করেন। পত্রিকাটি প্রকাশের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় 'সূচনা'র কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :

"বহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল, যে একখানি শিল্প বিষয়ক পত্র প্রকাশ করি, কিন্তু এত দিন ভরসা করিয়া, সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, মনে নানা সন্দেহের উদয় হইত। কিন্তু দেখিতেছি ক্রমেই আমাদের দেশীয়গণের শিল্পে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে; এই সময়ই শিল্প বিষয়ক পত্র প্রকাশের উপযুক্ত সময়, এই সময় ধীরে ধীরে সাধারণের সমক্ষে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের শিল্পবিষয়ক কীর্ত্তিসকল উপস্থিত করিতে পারিলে, বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা। পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে, মনে পুনরায় সেইরূপ গৌরব লাভের চেষ্টা হইতে পারে।

"বিজ্ঞান বিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, রাজনীতি সমাজ-নীতি বিষয়ে স্বতন্ত্র পত্র আছে, এজন্য আমরা প্রথমতঃ কেবল শিল্প বিষয়েই আলোচনা করিব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, যে আমাদের দেশে আজিও শিল্পের এতদূর উন্নতি হয় নাই—অথবা শিল্প প্রিয় এত অধিক লোক নাই—যে কেবল শিল্পের উন্নতির জন্যই আমাদের এই পত্র পাঠ করেন; এই জন্য প্রধানতঃ শিল্প বিষয়ই আমাদের লক্ষ্য হইলেও সাধারণতঃ পাঠকের পাঠোপযোগী প্রবন্ধ প্রয়োজন মত চিত্রাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া প্রকাশিত করিব।"

পত্রিকাটির সপ্তম সংখ্যায় 'দু-একটি কথা' শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয়তে আমরা দেখিতে পাই যে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন যে নানা কারণে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ছয় মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিতে হইয়াছে। অথচ এই সময়ে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য প্রচারিত একটি হ্যাণ্ডবিলে লিখিত বিজ্ঞাপনে অন্য সুর শোনা যায়। তাহার শেষ পংক্তিটি এইরূপ :

"জগদীশ্বরের কৃপায় ও সাধারণের অনুগ্রহে আমরা পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা অনুগ্রাহক পাঠক-পাঠিকার হস্তে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছি; এবং দিন দিন যেরূপ গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইহার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত হইতে পারি।"

দুঃখের বিষয় পত্রিকা প্রকাশকদিগের এই আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর ছয়টি সংখ্যা বাহির হইবার পর পত্রিকাটি উঠিয়া যায়। ইহার কারণ অবশ্য পত্রিকার পক্ষ হইতে না জানান হইলেও সহজেই অনুমেয়। তাহা অনুগ্রাহক(বিজ্ঞাপনদাতা?)ও গ্রাহকগণের অনুকম্পার অভাব অর্থাৎ মোটাকথায় অর্থাভাব। বলাবাহুল্য আজিও অধিকাংশ পত্রিকারই এই ব্যাধি হইতেই অকাল মৃত্যু ঘটে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শিল্পপুষ্পাঞ্জলির ছয় মাস পূর্ণ হইলে গ্রাহক সংখ্যা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা হইয়া ছিল। উল্লিখিত হ্যাণ্ডবিলে বলা হয় যে যিনি শিল্প-পুষ্পাঞ্জলির জন্য তিন জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন তাঁহাকে এক জোড়া আর্টিষ্ট প্রেশের ভাল তাস *উপহার দেওয়া হইবে। তেমনি ১০ জন গ্রাহক করিতে পারিলে তাঁহাকে এক খণ্ড শিল্পপুষ্পাঞ্জলি উপহার দেওয়া হইবে।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলির লেখা ও চেহারা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় দিতে হইলে আমাদিগকে উল্লিখিত হ্যাণ্ডবিল হইতে পুনরুদ্ধৃতি করিতে হয় :

"আমরা কতিপয় সুপরিচিত ও সুলেখকের সাহায্যে ও যত্নে এই প্রকৃত নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। ইহা প্রতি মাসে ডিমাই পেজী ছয় ফর্মা আকারে মুদ্রিত হয়। ইহাতে অন্ততঃ চার খানি

*অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আর্টিষ্ট প্রেশের এই তাসটির একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করা হইল : "সপ্তমবার মুদ্রিত আর্টিষ্ট প্রেশের রাজা মার্কা তাস প্রায় নিঃশেষিত হইল। এত অল্পদিনের মধ্যে আমাদিগের আশাতীত সংখ্যা বিক্রয় হওয়ায় আমরা উৎসাহিত হইয়া বিলাত হইতে রং ও কল প্রভৃতি আনাইয়া অপেক্ষা কৃত সুলভ মূল্যে নানাবিধ উৎকৃষ্ট তাস প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। রাজা মার্কা তাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণ—পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং—রুইতনের সাহেব, তাঁহার মহিষী ঝিন্দন—বিবি; সেনাপতি গোলাম সিং—গোলাম; গুরদরবার—টেক্কা; এবং শিবাজি, আকবর ও হায়দর আলি ক্রমান্বয়ে হরতন, ইস্কাবন ও চিড়িতনের সাহেব, তাঁহাদিগের মহিষীগণ বিবি এবং সেনাপতিগণ গোলাম। নবরত্ন, তাজমহল ও জগন্নাথদেবের মন্দির—টেক্কা।

সুদৃশ্য বৃহৎ লিথোগ্রাফ চিত্র ও প্রয়োজনমত বিবিধ কাষ্ঠ খোদিত চিত্র (Wood Engravings) থাকে। স্বদেশী ও বিদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি, প্রসিদ্ধ স্থানের ও ঘটনার নয়নরঞ্জন চিত্র, রামায়ণ ও মহাভারত দৃশ্যাবলীর চিত্র সমন্বিত সুকুমার শিল্প, সরল বিজ্ঞান, কবিতা ও উপন্যাসাদি সরল সাধারণ বিষয়ক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ, উৎকৃষ্ট কাগজে পরিষ্কারভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে।...”

প্রথম ছয় খণ্ডের সন্নিবিষ্ট সূচী হইতে দেখা যায় যে

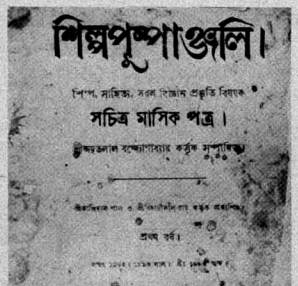
শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

২নং চিত্র : পরিচয় পত্র।

কনকলতা নামক উপন্যাস, কলিকাতার ইতিহাস, চিত্রবিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিজ্ঞান ও ধর্ম ও অন্যান্য নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়। লেখাগুলির অধিকাংশতেই লেখকের নাম অনুপস্থিত। প্রবন্ধগুলি সমস্তই অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে লিখিত এবং আজিকালিকার বুদ্ধিজীবী পাঠকদের নিকট ‘naive’ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সেগুলি আজিকালিকার অধিকাংশ প্রবন্ধের মতন বাক্যবহুল বা ন্যাকা নহে।

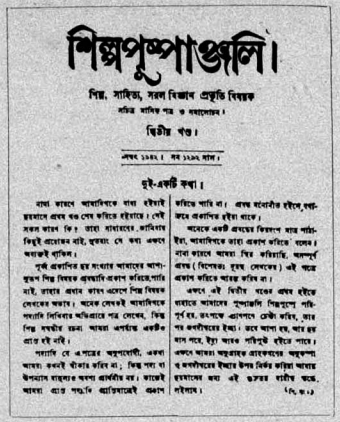
শিল্পপুষ্পাঞ্জলি।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দুই-একটি কথা।

৩নং চিত্র : একটি সাধারণ পাতা।

চিত্রবিদ্যা।

৪নং চিত্র : ২য় খণ্ডের প্রথম পাতা।

এই ছয় মাসে দীর্ঘ, নাতি দীর্ঘ ও হ্রস্ব আটটি পদ্য কাঠখোদাই সহ প্রকাশিত হয়। পদ্যগুলি সমস্তই ঘটনামূলক এবং অন্ধকার গোড়জন যাঁহারা “তোমার নিবিদে বাজাবো না ঝুমঝুমি” বা “আমার শেফালী জেবলী কেবল ঝরে জবাশঙ্কাসে” পড়িয়া আনন্দপান তাঁহাদের কেবলমাত্র হাস্যোদ্রেক করিতে সক্ষম হইবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পত্রিকায় কোনোরকম সমালোচনা বাহির হইত না।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলির কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটি “সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সর্বসাধারণের প্রীতিপ্রদ উপাদেয় করিবার জন্য” নিজেদের এনগ্রেভিং বিভাগে বহুসংখ্যক এনগ্রেভার ও লিথোগ্রাফার রাখেন।

পাঠক-পাঠিকাগণ এতক্ষণে হয়ত শিল্পপুষ্পাঞ্জলির চেহারা সম্বন্ধে আমাদের কি মতামত তাহা জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন। তাহা উপশম করিবার পূর্বে দুই-চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। আজিকালি আমাদের দেশের বই বা পত্রিকা খুলিলে তাহার প্রচ্ছদপট কে আঁকিয়াছেন, কে মুদ্রণ-লিপি ও লে-আউট করিয়াছেন, কে পুস্তক বা পত্রিকার ‘অঙ্গসৌষ্ঠব’ বর্ধন করার জন্য ছবি আঁকিয়াছেন, এমন কি কে তাহা বাঁধাইয়াছেন তাহার মবলক সকল খবরই পাওয়া যায়। বাংলা বায়োস্কোপের মতন বাংলা বইয়ের ‘ক্রেডিট টাইটেল’ও শেষ হইতে চাহে না। ইহা সাহিত্যে একটি খাঁটি বাঙ্গালী ‘অবদান’।

বলাবাহুল্য যে যুগে শিল্পপুষ্পাঞ্জলি বাহির হইয়াছিল তখন বইয়ের ডিজাইনার, টাইপোগ্রাফার ও লে-আউট শিল্পীর আবির্ভাবের বহু আগের যুগ। অথচ তখনকার দিনে বহু বই ও পত্রিকার ছাপা ও চেহারা এখনকার বহু বই বা পত্রিকার চেয়ে সকল দিক হইতে ভাল ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এখনকার ছাপা অধিকাংশ বাংলা বই হাতে লইলে দেখাযায় যে প্রকাশকেরা কেবল বহিরাবরণ বা মলাটটিকেই চকচকে করিতে ব্যস্ত। এমন কি ছাপার দিক হইতে পুস্তকের আর একটি প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ টাইটেল পেজ সম্বন্ধে দু'একজন প্রকাশক ছাড়া কাহাকেও সচেতন বলিয়া মনে হয় না। এই পাতাটিতে কি থাকা উচিত এবং কি না থাকা উচিত সে সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই হুঁশ আছে। অথচ ৭০।৭৫ বছর আগের এমন অনেকগুলি বইয়ের নাম করা যাইতে পারে যাহার টাইটেল পেজে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নামধাম এবং পুস্তক প্রকাশকের সন তারিখ ইত্যাদি অতি পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। কথাটা হয়ত শুনিলে অনেকেই রাগ করিবেন কিন্তু মনে হয় যে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের লেখা ও দেখার রুচি বোধ হয় আজিকার সাধারণ রুচি হইতে অনেকাংশে উন্নত ছিল।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলির কর্তৃপক্ষ একাধিক স্থলে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে শিল্পের কাগজ বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পত্রিকাটিকে লেখা ছাড়াও কাগজ, ছাপা, চিত্র ইত্যাদি সকল বিষয়েই নিখুঁত ও মনোরম করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের এই দাবী বলাবাহুল্য সম্পূর্ণ সত্য নহে। তবে একথাও ঠিক যে চেহারা বা ছাপার দিক হইতে অসাধারণত্ব না থাকিলেও ইহার গোড়া হইতে শেষ অবধি সর্বত্রই বেশ সৌন্দর্যবোধ ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা আমাদের এই লেখাটির সহিত শিল্পপুষ্পাঞ্জলির চারিটি ব্লক ছাপাইলাম। এগুলি দেখিলে পাঠক-পাঠিকাগণ পত্রিকাটির চেহারা সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ পাইবেন।

একটি ব্লক শিল্পপুষ্পাঞ্জলির পরিচয়পত্রের। (২নং চিত্র পশ্চ) এই পাতাটিতে কাঠের বড় টাইপে পত্রিকার নাম, পত্রিকাটি কি বিষয়ক, সম্পাদকের নাম, প্রকাশকের নামধাম এবং কোন্ প্রেস হইতে কবে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে ইত্যাদি সকল জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি জিনিস কিন্তু নানা আকারের হরফের সাহায্যে এমন সুন্দরভাবে স্পেস্ বা জায়গা ভাগ করিয়া এমন সরল ও পরিপাটিভাবে ছাপানো হইয়াছে যে পাতাটি পড়িতে শুধু সহজ নয় দেখিতেও সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ গোছালোভাবে পাতা সাজানো যে বড় সহজ নয় তাহা যাঁহারা এই কার্যে হাত দিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। শিল্পপুষ্পাঞ্জলির এই পাতাটির সহিত আজিকালিকার কোন একটি সাধারণ বাংলা বইয়ের টাইটেল পেজ লইয়া মিলাইয়া দেখিলে শিল্পপুষ্পাঞ্জলির কৃতিত্ব কোথায় তাহা বুঝা যাইবে। এস্থলে মুদ্রিত ৩নং ও ৪নং ব্লক দুইটি যথাক্রমে শিল্প-পুষ্পাঞ্জলির একটি সাধারণ পাতার এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। ৩নং ব্লকটি

দেখিলে বোঝা যাইবে যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পত্রিকার প্রকাশকেরা বুঝিতেন যে পত্রিকা পড়িবার জিনিস অতএব সবচেয়ে বড় কথা হইল যে তাহা যেন সহজে পড়া যায়। ইংকিং, লেডিং, স্পেসিং, ছাপার হরফের চেহারা প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি সুষ্ঠু ভাব রহিয়াছে এবং ছোট বড় হরফের ব্যবহারটিও লক্ষ্যণীয়। তৃতীয় ব্লকটি আমাদের নিকট সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয় কারণ এই পাতার 'লে-আউট' দেখিলে বোধ হয় যে, শুধুমাত্র সহজে পড়া নয় তাহা ছাড়াও চোখে সুন্দর দেখিবার কথাও মনে রাখিয়া পাতাটিকে সাজানো হইয়াছে। একমাত্র সরু প্রেস রুল ছাড়া কোন অলঙ্কারের ব্যবহার নাই। মাথার উপর জায়গা ছাড়িয়া সেন্টার ব্যালান্সিং এবং অত্যন্ত সোজাভাবে হরফগুলিকে বসানোর কায়দার জন্যই পাতাটির চেহারা এমন সুন্দর খুলিয়াছে।

১নং ব্লকটি কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ফুলমালা' নামক কবিতার সহিত মুদ্রিত একটি কাঠ-খোদাই।

ছবি হিসাবে এই কাঠ-খোদাইটি হয়ত খুব অসাধারণ কিছু নহে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইল ইহার সেই যুগের খাঁটি বাঙ্গালী ভাব। নায়কের গায়ে ডোরাকাটা প্লেটকরা সার্ট, পরণে কোঁচানো ধুতি এবং নায়িকার আটপৌরে শাড়ী—এই সকল তখনকার দিনের বেশভূষার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান যুগের অধিকাংশ শিল্পীর ছবিতে আজিকালিকার বাঙ্গালীর জীবনের এইরূপ "ডকুমেন্টারি" ছবি পাওয়া যায় না।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে বঙ্গ-ভাষার একটি 'অতুলনীয় অবদান' না হইলেও, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে একটুকু স্থান দাবী করিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হইল যে, যত সীমাবদ্ধভাবেই হউক না কেন, শিল্পপুষ্পাঞ্জলিই প্রথম লেখার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণকে বিশেষভাবে শিল্প সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সেইজন্যই আমরা আজ 'সুন্দরম্'-এর পক্ষ হইতে এই বিস্মৃতপ্রায় কাগজটিকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিলাম।

সভানেত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়

নিখিল ভারত হস্তশিল্পসংস্থা সম্মেলন

সভানেত্রীর ভাষনের সারাংশ

বন্ধুগণ—নিখিল ভারত হস্তশিল্পসংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কুটির-শিল্প বিক্রয় বিষয়ক সম্মেলনে আপনাদের আমন্ত্রণ করবার সুযোগ লাভ করে আন্তরিক প্রীতি লাভ করছি।.

আপনারা জানেন এবং অনেকেই হস্তশিল্পসংস্থা কর্তৃক পূর্বে এইরূপ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে জ্ঞাত হয়েছেন যে শুধু সম্মেলনে সভ্য হিসেবে উপস্থিত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য নয়—প্রত্যেক সম্মেলনেরই কিছু নির্দিষ্ট কার্যসূচী থাকে।

ত্রিবেন্দ্রামে প্রথম সম্মেলনের আলোচনার বিষয় ছিল উৎপন্নদ্রব্য ও বিক্রয় কেন্দ্রের মধ্যে উপস্থিত সম্বন্ধ নির্ণয়।

আমরা বুঝতে পেরেছিলাম হস্তশিল্প জাত দ্রব্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সামগ্রিক সংবাদ আমাদের গোচরীভূত নয়—সুতরাং বিক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন আলোচনা তখন অবাস্তব মনে হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। জিনিস উৎপন্ন করা ও তার বিক্রয় ব্যবস্থা এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একটির বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে অন্যটির কথা ভাবা যায় না।—সুতরাং আমাদেরও ঐ বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। যখনই আমরা হস্তশিল্প জাত জিনিসের বিক্রয় ব্যবস্থার কথা ভাবি তখনই হস্তশিল্পের উৎপাদনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হই—কারণ অল্প দ্রব্য সম্ভার থাকলে বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটে।

জুন মাসে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি আহরণের কাজ শেষ হয়েছে—তথ্য আহরণ কাজে নিযুক্ত সমিতির কার্য বিবরণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই তথ্য আহরণ কাজও একেবারে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হয়েছে বলতে পারি না কারণ প্রত্যেক হস্তশিল্প কারখানা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন হস্ত-শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ আহরণ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

আমরা ক্রমে অন্য সব বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করছি।

এই বোধহয় প্রথম হস্তশিল্প সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যার উপর নির্ভর করে আমরা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিক্রয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করতে পারি। এই কারণে তথ্যপূর্ণ এই বিবরণীটির মূল্য অনেক এবং আশাকরি আপনারা এই বিবরণ সম্বন্ধে চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পেয়েছেন এবং যে যে বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারের কি মত তা জেনে এসেছেন।

তথ্য সংগ্রহ সমিতির বিবরণে যে যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে আপনারা এই তিনদিন অবস্থান-কালে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে যা করণীয় তাহা সম্মেলনে পেশ করবেন।

এই কাজে অভিজ্ঞ লোকের সহযোগিতা সব সময়ে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমরা রূপায়িত করতে চলেছি। এই কারণে তথ্য সংগ্রহ কাজ আরও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। যদিও এই সংস্থা পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছে—এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তথাপি কোনরূপ তথ্য সংগৃহীত না থাকায় আমরা এ বিষয়ে কিছু পরিকল্পনা করতে পারি নি।

কিন্তু এই তিন বছরে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করতে আর বেগ পেতে হবে না। এই বিবরণীতে যে তথ্যগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। গত তিন বছরে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে আমরা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ হতেও পরিকল্পনাগুলিকে এককভাবে বিচার করেছি। পরিকল্পনাটিকে সাহায্য করবার জন্যেই আমরা তা গ্রহণ করেছি।

নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থার জাতীয় পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার মত রাষ্ট্রীয় কোন শাখা নেই। রাষ্ট্রের সহযোগিতা সর্ব বিষয়ে আবশ্যক—আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রের পরিকল্পনাগুলি সংযুক্ত হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিকল্পনাগুলি সত্বর পাঠাবার জন্যে আমি এখানে উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার কিরূপ আকার হওয়া উচিত তা স্থির করা আবশ্যক।

প্রদেশের বিক্রয় কেন্দ্র বাণিজ্য এবং সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত বিক্রয় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে হস্তশিল্পের জিনিসগুলি বিক্রয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয় ব্যবস্থা গঠনের সুপারিশ হয়েছে। এই সংগঠনে সংশ্লিষ্ট যত

বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি রাখা সম্ভব তাহাই রাখা উচিত।

* * *

দেশের মধ্যে হস্তশিল্প জিনিসগুলির চাহিদা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাজারে মালের কাটতি বাড়লে বিদেশের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাজার সম্প্রসারণ করে সমতা রক্ষা করতে হবে।

* * *

রপ্তানি ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে হলে কিছু অর্থ সঙ্গতির প্রয়োজন—কারণ টাকা পড়ে থাকবে—বাকীতে মাল দিতে হবে। তা ছাড়া কতগুলি জিনিস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে—কিছুদিন অপেক্ষা করে তবে জিনিসের মূল্য আদায় হবে। এই মূল্য আদায়ের ব্যাপারে ছয় মাস হতে এক বৎসরও সময় লাগতে পারে—এই কারণে আমাদের অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদেশে রপ্তানির বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যে একটি রপ্তানি সাহায্য সমিতি সংগঠন প্রয়োজন এবং সেইজন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। সমিতির আকার নিয়মাবলী এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্যেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

* * *

বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থার উন্নতির পথে অগ্রসর হবার জন্যে রাষ্ট্রের নির্দেশে হস্ত শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হোয়ে থাকে। ইস্পাত, মোটর, বস্ত্র, চিনি প্রভৃতির বৃহৎ শিল্প অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিটি মানুষ বৃক্ষ সেখানে যে এইরূপ সাহায্য কত বেশী প্রয়োজন তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি হবে।

* * *

শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য কিম্বা আধুনিক প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হলে তাদের সংগঠন করতে হবে—এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকলে কোনরূপ সাহায্য করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। শিল্পীদের পরস্পরকে নিয়ে সমিতি সংগঠন আবশ্যক। কাঁচামাল খরিদ, দক্ষ শিল্পী নিয়োগ, যন্ত্রপাতি খরিদ ইত্যাদি ব্যাপারও সমিতির সাহায্যে হতে পারবে। কার্ভে কমিটির বিবরণীতেও এইরূপ সংগঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

খবরাখবর

বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীযুক্ত চিন্তামনি কর কলকাতা গবর্ণমেণ্ট কলেজ অফ আর্টের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর এতদিন ঐ পদটি শূন্য ছিল। শ্রী করমহাশয়কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত উৎপল দত্তের সম্পাদনায় 'পাদপ্রদীপ' নামে একটি রঙ্গমঞ্চ ও চলচিত্র বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের নিজের তোলা 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি ষ্টিল ছবি দৈবক্রমে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী প্যাব্‌লো পিকাসোর নজরেতে পড়ে। পিকাসো ছবিগুলি দেখে কম্পোজিসন প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসা করেন এবং 'পথের পাঁচালী' চলচিত্রটি দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

'পাদপ্রদীপ' পত্রিকাটির উদ্বোধন উপলক্ষে লিট্‌ল থিয়েটার গত ৭ই আগস্ট তারিখে মহারাষ্ট্র নিবাসে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের প্রথমে আলীআকবর সরোদ বাজান। তারপর লিট্‌ল থিয়েটার মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি অভিনয় করেন। এত নিঁখুত প্রহসন অভিনয় বাংলাদেশের

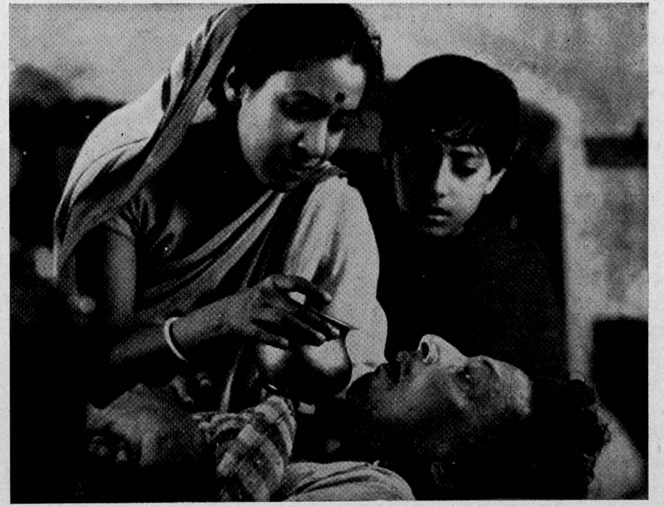

সত্যজিৎ রায়ের নতুন চলচিত্র 'অপরাজিত'র একটি ষ্টিল।

রঙ্গমঞ্চে একটি বিরল ঘটনা। সর্বোপরি উৎপল দত্ত মহাশয়ের অভিনয় দেখে আমাদের মনে হয়েছে তিনি যে কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতার সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার যোগ্য অভিনেতা।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় 'ফ্যামিলি অফ ম্যান' আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীটি প্রথম আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হয়। তার পর ভারতবর্ষের বোম্বাই এবং দিল্লী হয়ে কলকাতায় আসছে। প্রদর্শনীটির বিষয়বস্তু হল নিখিলবিশ্বের মানব-জাতির জীবন কাহিনী। প্রদর্শনীটিতে পাঁচশ খানি আলোকচিত্র দেখান হবে এবং অধিকাংশই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলোকচিত্র শিল্পীদের তোলা।

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলকাতা শহরে চীনদেশের একটি ভ্রাম্যমান কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। শ্রীমতী রাহু মুখার্জি, শ্রীচিন্তামনি কর ও বহু অন্যান্য শিল্পী, শিল্পরসিক এবং গুণী ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। চীনের এই শিল্প প্রদর্শনীকে আমরা আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাই।

স্বনামধন্য শিল্পী এবং লক্ষ্ণৌ সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার মহাশয় বাঙ্গালোরে 'নক্শা তৈয়ারী কেন্দ্র' অথবা ডিজাইন সেণ্টারের অধিকর্তারূপে নিযুক্ত হয়েছেন। ইহা নিখিল ভারত হস্তশিল্পসংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপিত হোয়েছে এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন দপ্তরের অধীন। আমরা শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদারকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পয়লা সেপ্টেম্বর হতে কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটি শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হবে। বিনা ব্যয়ে উক্ত প্রদর্শনীতে নিজ নিজ দ্রব্যাদি বিক্রয় এবং প্রদর্শনের জন্য কুটির ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদকগণকে আগামী পনেরই আগস্টের মধ্যে কোলকাতার পাঁচ ও ছ নং হেয়ার ষ্ট্রীটে শিল্প অধিকারের গুদাম ও বিক্রয় কেন্দ্রে দ্রব্যাদি পাঠাতে অনুরোধ করা হোচ্ছে। আমরা এইরূপ আন্তঃপ্রদেশীয় প্রদর্শনীর বিশেষ পক্ষপাতী। এতদ্বারা সাধারণের অনেক উপকার হোয়ে থাকে। যাঁরা অন্য প্রদেশে ভ্রমণের সুযোগ পাননা তাঁরা এক জায়গায় বহু প্রদেশের জিনিস এক সঙ্গে দেখতে পান এবং অন্যান্য প্রদেশের নানারূপ কুটির এবং হস্তশিল্পের নমুনা দেখে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ লাভে সমর্থ্য হন।

কিছুদিন হোল কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি কৃষ্টিদল রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ পরিভ্রমণে গেছেন। আনন্দবাজারের বিশেষ পৃষ্ঠায় সদলবলে শ্রীযুক্ত চন্দের একটি আলোক চিত্র প্রকাশিত হয়। আমরা ইহাতে খুবই আনন্দ লাভ কোরলাম, কারণ শ্রীমতী চন্দও এই দলে আছেন। শুনেছি শ্রীমান চন্দও আছেন। শ্রীমতী চন্দ কেবলমাত্র স্বনামধন্যা শিল্পীই নন সুলেখিকা হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট সমাদর। শোনা গেছে শ্রীমান চন্দও ভাল ছবি এঁকে থাকেন। এইরূপ পরিবেশে যেসকল প্রতিনিধিরা সঙ্গে চলেছেন,তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের দেশের শিল্প ও নানারূপ কলা ঐসকল দেশে মনের আনন্দে পরিবেশন কোরতে সক্ষম হবেন মনে হয়।

বিশ্বস্তসূত্রে শোনা যাচ্ছে বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয় হস্তশিল্প এবং কুটিরশিল্প জাত দ্রব্যাদি নির্মাণ কুশলতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য শীঘ্রই জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। শ্রদ্ধেয় ডাঃ রায়ের হস্তশিল্প এবং কুটিরশিল্পের প্রতি অনুরাগের কথা সকলেই অবগত আছেন। আমরা তাঁর যাত্রার পূর্বে তাঁর প্রতি আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও আস্থা নিবেদন করছি।

কমার্শিয়াল রিপ্রোডাকশন সার্ভিস একটি ব্লক তৈরীর প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনিল নাথ ও কর্মাধ্যক্ষ শ্রীপরেশ ঘোষ দুজনেই শিল্পী—আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। সেই কারণে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আশা করি। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'সুন্দরম'-এর অধিকাংশ এক রংয়া ব্লকগুলি তাঁদের তৈরী।

It pays to Advertise

IN

AWAHON

The Journal has entered 27th year of existence. It is the most popular amongst the Journals and periodicals of Assam. Its great influence has been manifested in its establishing in the history of Assamese literature an era known as 'AWAHON'. The prestige and patronage it enjoys, are not only unique in Assam but rare instance of distinction for any language Journal in India.

Contact our Calcutta Office :

AWAHON

54, GANESH CHANDRA AVENUE, CALCUTTA—13

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

চতুরঙ্গ

বাঙ্গলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ থেকে আজ পর্যন্ত গত সতেরো বছর চতুরঙ্গ বাংলার কৃষ্টি ও সাহিত্যকে জীবনের উন্নত মানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে।

অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

এ-সংখ্যায় আছে—উপন্যাস :—চাঁদবেনে—অমিয়ভূষণ মজুমদার ॥ প্রবন্ধ :—ছাত্র—অসন্তোষ ও তার প্রতিকার—হুমায়ুন কবির॥ সমালোচনার পদ্ধতি—অমলেন্দু বসু॥ ডায়লেকটিকস্-এর পুনর্বিচার—অতীন্দ্রনাথ বসু॥ কবিতা :—বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, অশোকবিজয় রাহা ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়॥ আধুনিক সাহিত্য—নীহাররঞ্জন রায়॥ সমালোচনা :—সরোজ আচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বিনয় ঘোষ, নৃপেন্দ্র সান্যাল ইত্যাদি।

প্রতি সংখ্যা ১৵০, বার্ষিক ৪৸০ আনা ভি. পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

নমুনা সংখ্যার জন্য ১।০ অগ্রিম পাঠাতে হয়।

কার্যালয়—৫৪, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা—১৩

Still they hold a leading position

C... *Correct reproduction*

R... *Reliability*

S... *Service personalized*

রা বছর চতুরঙ্গ বাংলার কৃষ্টি ও

ঃ—ছাত্র—অসন্তোষ

they are . . . .

- *BLOCK MAKERS*
- *PRINTERS*
- *COM. PHOTOGRAPHERS*

PHONE
23-1117

...MMERCIAL REPRODUCTION SERVICE

...ACRES LANE, CALCUTTA—1

CO...

For any type of Construction work

Consult

KUNAL ENGINEERING

AND

CONSTRUCTION CO.

Govt. Contractors & Engineers

Office :

41-B, W. C. BONERJEE STREET, CALCUTTA-6

• interior

decorators

• painting

contractors

NU-STORES (PRIVATE) LIMITED.

58A, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA Phone: 44-2428